স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
২য় বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৩

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস

প্রচ্ছদ ❑ মনোজ দে

বিনিময় ২০ টাকা
প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় ২

চিঠিপত্র ২২

শরীর

স্তন-ক্যানসার ❑ ডা. সুজয় বালা ৩৪
জন্ডিস ও ভাইরাল হেপাটাইটিস ❑ ডা. নবারুণ ঘোষাল ৩
মধুমেহ ও চোখ ❑ ডা. চন্দন বারি ১৬
মাথাঘোরা বা ভার্টিগো ❑ ডা. পার্থপ্রতিম পাল ২৭
লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা ❑ ডা. তন্দ্রা ঘোষ ৩১
অবাঞ্ছিত লো ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ৪২
শল্যচিকিৎসার প্রস্তুতি ❑ ডা. নীহার রঞ্জন মণ্ডল ১৭

মন

মনোরোগের চিকিৎসায় কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি ❑ রুমঝুম ভট্টাচার্য ৪৭

শরীর সমাজ বিজ্ঞান

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৭
ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান—
জনমুখী প্রকল্প না নিছক ভাঁওতাবাজি? ❑ ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ১২
বিকল্প চিকিৎসা না চিকিৎসার বিকল্প? ❑ রাজা ভট্টাচার্য
জনস্বাস্থ্যের বিকাশ না স্বাস্থ্যের জন্য বড় প্রযুক্তি—
রাস্তাটা কোন দিকে? ❑ ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক ১৯
ভেজাল খাদ্য-ভয়ঙ্কর ❑ মানসরঞ্জন মাইতি ৪৪
ভাল হওয়ার মন্দ দিক ❑ স্বাতী ভট্টাচার্য ৩৯

স্মরণে

ডা. জোসেফ এডওয়ার্ড মারে ❑ ডা. জয়ন্ত দাস ৪৯

চলচ্চিত্রে ডাক্তার

অগ্নীশ্বর : ডাক্তার যখন ভগবান ❑ অংশুমান ভৌমিক ৫২

গল্প

বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ ❑ সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৫৫

কুইজ

অভিষেক দাস ২১

সম্পাদকীয়

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি এবং ক্যানসার হওয়ার আগেই চিকিৎসা

এত দিনে বোধ করি কারও জানতে বাকি নেই যে ক্যান্সারের ভয়ে হলিউডের চিত্রতারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি তাঁর দু'টো স্তনই কেটে বাদ দিয়েছেন। না, তাঁর স্তন ক্যানসার হয় নি, কিন্তু তাঁর মা ওভারির ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন, এবং তাঁর শরীরে এমন একটি জিনঘটিত ত্রুটি ছিল যাতে স্তন ক্যানসার ও ওভারির ক্যানসার—দুটো হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। অল্প কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এক বা একাধিক জিনগত ত্রুটি (BRAC-1 ও BRAC-2) থাকে, তাঁদের এই দু'টো ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। ক্যানসার হওয়ার আগে স্তন কেটে বাদ দিলে ক্যানসার হয় না। তাহলে আমরা কি বলব, ''ওঃ, ক্যানসারকে জব্বর বোকা বানানো গেছে এইবার''?

পরিপ্রেক্ষিতটা একটু দেখে নিলে বরং ভাল হয়। অধিকাংশ ক্যানসারই কিন্তু বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না, বা অন্য ভাষায় বলতে গেলে, অধিকাংশ ক্যানসারই 'জেনেটিক' রোগ নয়। ভারতে প্রতি বছর মোটামুটি দশ লক্ষ মানুষকে ক্যানসার আক্রমণ করে, আর তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মানুষের ক্যানসার বংশগত কারণে হয়, মানে শতকরা ৫ ভাগ ক্যানসার জিনগত কারণে হয়। সারা বিশ্ব জুড়ে বংশগত কারণে ক্যানসারের সংখ্যা শতকরা ২-৫ শতাংশের বেশি নয়। বাকি সব ক্যানসারের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই গুরুত্বপূর্ণ--- যেমন ধূমপানজনিত ফুসফুস-ক্যানসার।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি বড়মাপের চিত্রতারকা, এবং সারা বিশ্বজুড়ে পরিচিত মুখ। এরকম সেলেব্রিটি কিছু করলে সেটা নিয়ে বড় খবর হয়, সচেতনতা বাড়ে। এখন ভারতেও বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালে মানুষজন নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন— অ্যাঞ্জেলিনা যে পরীক্ষা করে স্তন বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই পরীক্ষাটা তাঁরাও করাবেন কি না। তবে এ দেশে খুব বেশি লোক অত খরচ করে পরীক্ষা আরও ওই রকম অপারেশন করাতে পারবেন না। জিন-পরীক্ষা করে ক্যানসারের সম্ভাবনা কতটা জোর দিয়ে ধরা যায়, সেটাও বিতর্কিত।

আর একটা কথা। দেশে দেশে আর্থিক সামর্থ্যের তারতম্য রয়েছে। এদেশে এই সার্জারি চালু হলে হয়তো ভারতের লোকের চেয়ে বিলেত-আমেরিকার মানুষ এখানে এই অপারেশন বেশি করাবেন। মেডিক্যাল ট্যুরিজম বাড়বে, আমেরিকানরা এসে এ দেশে পাঁচতারা হাসপাতালে তাঁদের দেশের তুলনায় কম খরচে অপারেশন করাবেন, আর আমাদের চিকিৎসককূল নিয়োজিত হবেন এ কাজে—অথচ আমাদের দেশে চিকিৎসকের গুরুতর ঘাটতি রয়েছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অন্য বহু জায়গায়।

এ ছাড়াও কিছু গোলমেলে কথা আছে। অ্যাঞ্জেলিনা বলেছেন, ''আমার সন্তানরা আমার ছোট্ট ক্ষতচিহ্নটি দেখতে পাবে, আর কিছু না। ... আর ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলতে পারি, (অপারেশনের ফলে) আমি নিজেকে নারী হিসেবে কম কিছু বোধ করছি না। আমার মনে হয় আমার ক্ষমতায়ন ঘটেছে, আমি একটা জোরালো সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং তাতে আমার নারীত্ব কিছুই কমেনি।'' অ্যাঞ্জেলিনার অপারেশনের ফলে যে কৃত্রিম স্তন স্থাপন করা হয়েছে, সেটা কতটা ভাল বা মন্দ, কতটুকু দৃশ্যমান ক্ষতচিহ্ন আছে, সেটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাঞ্জেলিনা মা হিসেবে বদলে না যাওয়ার কথা বলছেন। এবং তারই অব্যবহিত পরে বলছেন, তিনি নিজেকে নারী হিসেবে কম কিছু বোধ করছেন না। এটাকে তিনি তাঁর ক্ষমতায়ন বলছেন এবং বলছেন, অপারেশনের ফলে তাঁর ''নারীত্ব কিছুই কমেনি।'' এখানে একটা প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছেন। তাঁর 'নারীত্ব' কি কেবল স্তনের বহিরাঙ্গিক গঠনে সীমাবদ্ধ? আর একটা প্রশ্ন। তিনি স্তন ও ওভারি এ দু'টো প্রত্যঙ্গ বাদ দিচ্ছেন। BRACI1 জিন-এ মিউটেশন থাকলে এ দু'টো প্রত্যঙ্গের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি বাড়ে, এবং এদের বাদ দিয়ে বাঁচা সম্ভব। সুতরাং এটা একেবারে অযৌক্তিক কাজ, তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এর মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত পুরুষতান্ত্রিক রূপটা কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, স্তন এবং ওভারি অতি সহজেই কেটে বাদ দেওয়াটা আধুনিক চিকিৎসার একটা তত্ত্বগত প্রবণতা, যে প্রবণতা বলে যে 'প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে' স্তন, ওভারি ও জরায়ু ফালতু বোঝা। ডাক্তারের রায় দেখিয়ে এই নারীবাদী কণ্ঠকে চুপ করানো যাবে না; ডাক্তার তো সমাজের বাইরে নন, তাই সামাজিক মূল্যায়নে ডাক্তারদের মতটা বিশেষ গুরুত্ব পাবেই বা কেন?

এই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর এখনই পাবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং বিতর্ক চলুক, আমরা বরং স্বাস্থ্যের বৃত্তে এবারে স্তন-ক্যানসার কী ভাবে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা যায় ও চিকিৎসা করে সারানো যায়, সেই আলোচনায় মন দেব।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

জন্ডিস ও ভাইরাল হেপাটাইটিস

"কেস একেবারে জন্ডিস, বুঝলি? এখন আর ক'দিন পাড়ায় ঢুকে কাজ নেই, হেবি ঝাড় খেতে হবে।'' এই জাতীয় আধুনিক বাগ্‌ধারা থেকে জন্ডিস সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আতঙ্কের বহরটা বোঝা যায়। আতঙ্কের কারণ যে একেবারে নেই, তা নয়, তবে সাধারণত যতখানি না রোগ, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কের ফলে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েন, যার সুযোগ নেয় বিভিন্ন ধরনের হাতুড়ে ডাক্তার, দৈব চিকিৎসা ব্যবসায়ী, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, এবং কিছু অসাধু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির চিকিৎসকও। সত্যি কথা বলতে কী, যাঁরা কলেজে ঠিক মতোন পড়াশুনা করেননি বা প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে সেই পড়া মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, এমন অনেক চিকিৎসক জন্ডিস সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং সমাজে ছড়িয়ে দেন—লিখছেন **ডা. নবারুণ ঘোষাল।**

প্রথমেই বলা দরকার, জন্ডিস একটা রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। জ্বর যেমন ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের লক্ষণ হতে পারে, জন্ডিসও তেমনি বিভিন্ন ধরনের রোগের লক্ষণ হতে পারে। চোখ, মুখের ভেতরের আবরণ এবং গায়ের চামড়ার রঙ হলুদ হয়ে যাওয়া, গাঢ় হলুদ রঙের প্রস্রাব হওয়া আর সাদা বা মেটে রংয়ের পায়খানা হওয়া, এই সব লক্ষণগুলোকে একত্রে জন্ডিস বলা হয়।

জন্ডিস কী ভাবে হয় জানতে গেলে প্রথমে আমাদের রক্তের লাল রঙের ব্যাপারে একটু জানতে হবে। আজকাল স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই তথ্য জানে যে রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন বলে একটি পদার্থ থাকে, যার রং লাল এবং যা আমাদের ফুসফুস থেকে দেহকোষগুলোতে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়। এই হিমোগ্লোবিন থাকে রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে, যার আয়ুষ্কাল হল ১২০ দিন। তারপর লোহিতকণিকাগুলো ভেঙে যায় এবং তার মধ্যের হিমোগ্লোবিন অণুগুলো ভেঙে গিয়ে হিম নামে একটা লৌহঘটিত রঙিন অণু আর গ্লোবিন নামে কয়েকটা প্রোটিন অণুতে বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর হিম নামের রঙিন অণু আবার ভেঙে গিয়ে লোহার অণুগুলো আলাদা হয়ে যায় এবং বিলিরুবিন বলে একটা হলুদ রঙের অণু তৈরি হয়ে রক্তে মিশে যায়। লোহার অণুগুলো নতুন লোহিতকণিকার মধ্যে গিয়ে আবার হিমোগ্লোবিন তৈরিতে কাজে লাগে।

এই বিলিরুবিন নামে হলুদ রঙের অণুটি হল একটা বর্জ্য পদার্থ। কিন্তু তা জলে ভালভাবে দ্রবণীয় নয়। তাই তা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই বিলিরুবিন আমাদের লিভারে গিয়ে একটা এনজাইম বা উৎসেচকের প্রভাবে দ্রবণীয় বিলিরুবিনে পরিণত হয়। এই দ্রবণীয় বিলিরুবিন পিত্তরসের সঙ্গে মিশে লিভার থেকে বের হয়ে পিত্তথলি বা গল ব্লাডারে যায়। পিত্তথলি এই পিত্তরসকে আরও ঘন করে নিয়ে জমা করে রাখে। পিত্তরসের ধর্ম সাবানের মতন, যা কি না তেল বা চর্বিজাতীয় পদার্থকে জলে মিশে যেতে সাহায্য করে। আমরা যখন তেল জাতীয় খাবার খাই, তখন গল ব্লাডার থেকে পিত্তরস বেরিয়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রে চলে আসে আর সেই তেলকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে হজম করতে সাহায্য করে। পিত্তরসের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণীয় বিলিরুবিনও ক্ষুদ্র অন্ত্রে চলে আসে, যা পরে আমাদের মলের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে যায়।

এই বিলিরুবিনের জন্যই আমাদের মলের রঙ হলুদ হয়। অবশ্য মলে ঠিক বিলিরুবিন থাকে না, কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তা কিছুটা পালটে যায়, তবে সেই আলোচনা এখানে ততটা দরকারি নয়।

কখন জন্ডিস? এ বার মনে করুন আমাদের লিভারে এমন কোনও রোগ হল, যার ফলে লিভারের কোষগুলো ফুলে উঠে দ্রবণীয় বিলিরুবিনের বেরিয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তখন সেই দ্রবণীয় বিলিরুবিন লিভার থেকে রক্তে ফিরে গিয়ে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। এই অতিরিক্ত বিলিরুবিন চোখের সাদা অংশে, মুখের আবরণের নীচে, গায়ের চামড়ার নীচে জমা হয়ে সেগুলোকে হলুদ করে তুলবে। যেহেতু এই বিলিরুবিন দ্রবণীয়, সুতরাং তা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে থাকবে। ফলে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যাবে। যেহেতু বিলিরুবিন পিত্তরসের সঙ্গে বেরিয়ে অন্ত্রে পৌঁছতে পারছে না, সুতরাং মলের রং হলুদ হতে পারবে না। চর্বিজাতীয় খাবার ভাল ভাবে হজম হবে না এবং তা মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার ফলে মলের রং সাদাটে দেখাবে। লিভারের কোষের রোগে (যেমন আমাদের পরিচিত ভাইরাল হেপাটাইটিস-এ) প্রথম দিকে কেবল দ্রবণীয় বিলিরুবিন বেড়ে যায় বটে, পরের দিকে কিন্তু অদ্রবণীয় বিলিরুবিনও বাড়ে, কেননা লিভারের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে অদ্রবণীয় বিলিরুবিনকে দ্রবণীয় বিলিরুবিনে পরিবর্তনের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারে না।

কী কারণে জন্ডিস?

এখন প্রশ্ন হল, লিভারে কী কী রোগ হলে বিলিরুবিনের বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হতে পারে? খুব সহজ ভাবে বোঝা যায়, যদি পিত্তনালীতে পাথর হয়, তবে এমনটা হতেই পারে, এবং সেই পাথর বের না করা পর্যন্ত জন্ডিস সারবে না। কিন্তু লিভারের কোষ ফুলে উঠে রাস্তা বন্ধ হওয়ার আরও অনেক রকম কারণ থাকে। তুঁতে বা কপার সালফেট খেলে লিভারের কোষ নষ্ট হয়ে গিয়ে এরকম হতে পারে। বেশি মদ খেলেও এরকম হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রেই কিন্তু জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া আছে জীবাণুঘটিত

কারণ। কয়েক ধরনের ভাইরাসের পছন্দের জায়গা হল লিভারের কোষ। এই ভাইরাসগুলোকে বলা হয় হেপাটাইটিস ভাইরাস। হেপাটাইটিস কথাটা গ্রিক ভাষার থেকে এসেছে, যার অর্থ হল লিভারের অসুখ। এ পর্যন্ত পাঁচ রকমের হেপাটাইটিস ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি' এবং 'ই'। এ ছাড়াও কয়েক ধরনের ভাইরাস লিভারকে আক্রমণ করে, তাদের কথায় যাচ্ছি না। এই পাঁচ রকমের মধ্যে 'এ' আর 'ই' এই দুই ধরনের ভাইরাস জলের মাধ্যমে ছড়ায়। রোগীর মল যে জলে মেশে, সেই দূষিত জল পান করলে এই ভাইরাস শরীরে ঢুকে পড়ে। এই দু'রকম ভাইরাসের মধ্যে হেপাটাইটিস 'ই' ভাইরাস একটু বেশি ক্ষতিকর, তবে সাধারণত এই দু'রকম রোগই নিজের থেকে সেরে যায়, খুব একটা ক্ষতি করে না। হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' ভাইরাসের সংক্রমণের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই দু'রকমের ভাইরাস রক্ত অথবা দেহরসের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। রোগীর ওপরে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ব্যবহার করলে, রোগীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করলে অথবা রোগীর রক্ত গ্রহণ করলে এই রোগ শরীরে ঢুকতে পারে। হেপাটাইটিস 'বি' রোগের আজকাল টিকা আছে, ওষুধও আছে। তবে এই রোগ হওয়ার পর সময়ে চিকিৎসা না হলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রোগী পরে মারা যান। হেপাটাইটিস 'সি' রোগের কোনও টিকা নেই এবং এই রোগের ভাল কোনও চিকিৎসা এখনও করা যায় না। এই রোগ অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয়, যা থেকে লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার ইত্যাদি হতে পারে। হেপাটাইটিস 'ডি' ভাইরাস একমাত্র সেই রোগীকেই আক্রমণ করতে পারে, যার একবার হেপাটাইটিস 'বি' হয়ে গেছে।

এই ভাইরাসগুলো ছাড়া যে সব জীবাণু লিভারকে আক্রমণ করে তারা হল অ্যামিবা অর্থাৎ আমাশয়ের জীবাণু, প্লাসমোডিয়াম অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার জীবাণু, লেপ্টোস্পাইরা নামের জীবাণু যা ইঁদুর, কুকুর এইসব প্রাণীর মূত্রের মাধ্যমে মানুষের চামড়ায় লেগে শরীরে ঢুকতে পারে। এই সবগুলো রোগেরই বাড়াবাড়ি হলে জন্ডিস দেখা দিতে পারে। তবে সংখ্যার হিসেবে ভাইরাসঘটিত হেপাটাইটিস বেশি হয়।

জন্ডিস হলে কী করবেন?

এ বার আসি সাধারণত আমরা যে ধরনের জন্ডিস দেখতে পাই, সেগুলোর ব্যাপারে। সাধারণভাবে, জলবাহিত হেপাটাইটিসগুলো অর্থাৎ হেপাটাইটিস 'এ' আর হেপাটাইটিস 'ই' রোগ দু'টোই বেশি দেখা যায়। জন্ডিস হলে কী করবেন?

১। ডাক্তার দেখাবেন। বিশ্বাস করুন, হাতুড়ে চিকিৎসক অথবা দৈবী ওষুধ দেওয়া অশিক্ষিত লোকেদের তুলনায় আপনার ডাক্তারবাবু এই রোগটির ব্যাপারে অনেক বেশি জানেন।

২। ডাক্তারের পরামর্শমতো রক্ত পরীক্ষা করাবেন। রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা কতটা বেড়েছে আর লিভারের কোষগুলো কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা জানাটা একান্ত জরুরি। এ ছাড়া কোন জাতীয় ভাইরাস আক্রমণ করেছে, তা জানতে পারলেও ভাল হয়, তবে এই পরীক্ষাটা একটু খরচসাপেক্ষ। কিন্তু হেপাটাইটিস 'বি' হয়ে থাকলে সময়ে ভাইরাসবিরোধী ওষুধ দিলে সেরে যায়। তাই এখানে জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং হেপাটাইটিস 'বি'-র পরীক্ষাটা করিয়ে নেওয়াই ভালো।

৩। সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন। আপনার লিভারের কোষগুলো এই সময়ে ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে, কাজেই শরীরের বেশি ঝাঁকুনি হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আর লিভারের একটা কাজ হল পরিশ্রমের সময় আপনার শরীরকে জ্বালানি অর্থাৎ গ্লুকোজ সরবরাহ করা। এই গ্লুকোজ লিভারের মধ্যে গ্লাইকোজেন অণু হিসেবে সঞ্চিত থাকে। পরিশ্রমের সময় লিভার সেই গ্লাইকোজেন অণুকে ভেঙে গ্লুকোজ সরবরাহ করে। লিভারের কোষগুলো অসুস্থ থাকলে তারা এ কাজ ভালভাবে করতে পারে না। কাজেই এ সময় বেশি পরিশ্রম করলে শরীরে গ্লুকোজের অভাব দেখা দেবে।

৪। এই একই কারণে রোগীকে এমন শর্করাজাতীয় খাদ্য দেওয়া যেতে পারে যেগুলো সহজে গ্লুকোজে পরিণত হয়। আখের রস খাওয়ার দরকার নেই, চিনি কিংবা গ্লুকোজের জল খাওয়া একই ব্যাপার। আখের রসের সঙ্গে অন্যান্য জীবাণু পেটে গেলে পেট খারাপ হতে পারে, তখন আবার ওষুধ খেতে হবে, জন্ডিসে যা না খাওয়াই ভাল।

প্রথম দিকে অনেক সময় রোগীর খুব বমি হয়, এমনকী জলটুকু পর্যন্ত খাওয়ানো মুশকিল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় চিনি কিংবা গ্লুকোজের জল বা শর্করাজাতীয় খাদ্য খাওয়া যায় না। এরকম অবস্থায় শরীরে গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দিতে পারে, অবশ্য সেটা খুব চট করে হয় না। এর প্রতিকার হিসেবে রোগীকে শিরার মধ্য দিয়ে ঘন গ্লুকোজের জল দিতে হয়, যার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার দরকারও হতে পারে। আবার বলি, সচরাচর যে জন্ডিস দেখা যায় সেই জলবাহিত ভাইরাল হেপাটাইটিস-এর ক্ষেত্রে এতটা করার দরকার হয় না বললেই চলে।

৫। বেশি ওষুধ খাবেন না। টোটকা ওষুধ তো নয়ই, আপনার ডাক্তারবাবু লিখে দিলেও না। মনে রাখবেন, প্রতিটা ওষুধেরই বিষক্রিয়া থাকে, আর লিভারই সেই ওষুধের বিষক্রিয়া নষ্ট করে, ওষুধের অণুকে ভেঙে শরীর থেকে বের করে দেয়। লিভার নিজেই অসুস্থ থাকলে সে এ কাজ ভালভাবে করতে পারে না। ফলে ওষুধ শরীরে জমতে থাকে। হেপাটাইটিস 'এ' কিম্বা 'ই'-র কোনও ওষুধ নেই, এই রোগ দু'টি কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের থেকে সেরে যায়। অনেক ডাক্তার বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ, হজমের ওষুধ, বিভিন্ন সিরাপ ইত্যাদি লিখে থাকেন যেগুলোর কোনও সুফল প্রমাণিত হয়নি। প্রথম তিন চার দিনের জন্য ডাক্তারবাবুর নির্দেশ অনুসারে সামান্য কিছু বমির ওষুধ বা পেটব্যথার ওষুধ খাওয়া চলতে পারে। বেশি জ্বর হলে সাধারণের চেয়ে একটু কম মাত্রায় প্যারসিটামল খাওয়া চলতে পারে, তবে মনে রাখা উচিত, এই ওষুধও কিছুটা পরিমাণে লিভারের ক্ষতি করে।

৬। কয়েকটা সাধারণ ধারণা আছে। জন্ডিস হলে সেদ্ধ খাবার খেতে হয়, তেল খাওয়া চলে না, এমনকী তেল মাখাও চলে না। রুটি খাওয়া চলে না, মাছ-মাংস-ডিম তো নয়ই। হলুদও নাকি খেতে নেই। এ সবই সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শুধু জন্ডিস নয়, যে কোনও ভাইরাসঘটিত অসুখেই প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি করে খাওয়া উচিত, যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, শরীরের ক্ষতি তাড়াতাড়ি পূরণ হয়ে যায়। জন্ডিসের প্রথম কয়েক দিন ক্ষিদে থাকে না, বমি বমি লাগে, তখন মাছ-ডিম খেলে বমি হয়ে যেতে পারে। সে কদিন শর্করাজাতীয় খাদ্যই ভালো, আর রোগীর পছন্দমতন বাড়িতে রান্না করা খাবার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু

কয়েকদিন পরে বমির ভাব কেটে গিয়ে ক্ষিদে বেড়ে যায়, তখন মাছ-ডিম-মুরগির মাংস খেতে দেওয়া উচিত, নিরামিশাষীরা ডালজাতীয় খাবার আর সোয়াবিনের তরকারি খেলে ভাল হয়। তবে ঝাল খেলে পেট ব্যথা করতে পারে, আর বেশি তেল খেলে পাতলা পায়খানা হতে পারে। অল্প মশলা আর তেল দেওয়া চলবে। আর রুটি না খাওয়ার ধারণাটা যে কোথা থেকে এসেছে, তা বলা মুশকিল, তবে ধারণাটা ভুল। রুটি খেলে কোনওই অসুবিধে নেই। হলুদ না খাওয়ার ধারণাটা জন্ডিস রোগীর হলুদ রং দেখে আসতে পারে, তবে এ হলুদের সঙ্গে বিলিরুবিনের হলুদের যে কোনও সম্পর্ক নেই, তা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

আমি ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে ডাক্তারি করি। এখানে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে সর্দি হলে জন্ডিস সেরে যায়। এজন্য তারা রোগীকে নানা রকমভাবে ঠান্ডা লাগাতে চেষ্টা করে, নোংরা জলে স্নান করায়। এ সব করে অনেক সময়ে নিউমোনিয়া বাধিয়ে নিয়ে আসে। তখন তাদের নানান অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি দিতে হয়, যা জন্ডিসের সময়ে না দেওয়াই ভাল ছিল।

৭। রোগীর সব সময়ে স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করা উচিত, কারণ মলের মাধ্যমেই হেপাটাইটিস 'এ' এবং 'ই' ভাইরাস খাবার আর পানীয় জলে মেশে। রোগীর প্যান্ট কিংবা জাঙ্গিয়ায় ভাইরাস লেগে থাকার সম্ভাবনা, কাজেই সেগুলোকে সাবধানে কাচা উচিত। শহরের জল সরবরাহের পাইপগুলো প্রায়ই ফেটে গিয়ে সেগুলো থেকে জল বেরিয়ে আসে। জল সরবরাহ বন্ধ হলে সেই রাস্তা ধোয়া জল আবার ফিরে পাইপের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। রাস্তার নোংরার মধ্যে রোগীর মল মিশে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কাজেই ত্রুটিপূর্ণ জল সরবরাহ ব্যবস্থা জন্ডিস ছড়ানোর একটা অন্যতম কারণ। এর প্রতিকার হিসেবে জল ফুটিয়ে খাওয়া ভাল।

৮। আজকাল হেপাটাইটিস 'বি' আর হেপাটাইটিস 'এ'-র টিকা বেরিয়েছে। একটু খরচসাপেক্ষ। তবে হেপাটাইটিস 'বি' রোগটা মারাত্মক বলে আমি আমার রোগীদের সামর্থ্য থাকলে টিকা নিয়ে নিতে উপদেশ দিই। হেপাটাইটিস 'এ'-র টিকার দাম আরও বেশি। এই রোগটাও তেমন মারাত্মক নয়, তবে সাধ্য থাকলে টিকা নিয়ে নিতে পারেন।

কেন আতঙ্ক?

জন্ডিস যদি এত সহজে নিজের থেকেই সেরে যায়, তা হলে জন্ডিস সম্পর্কে এত আতঙ্কের কারণ কি?

১। প্রথম কারণ, শরীর হলুদ হয়ে যাওয়া, যা দেখে সাধারণ মানুষের ভয় লাগারই কথা।

২। দ্বিতীয়ত আগেকার দিনের বিভিন্ন ভুল ধারণার ফলে রোগীকে খেতে না দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া হত, তার ওপর নানা টোটকা ওষুধ খাইয়ে লিভারের আরও ক্ষতি করা হত। এর ফলে রোগী দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করতেন, অনেকে মারাও যেতেন।

৩। হেপাটাইটিস 'বি', 'সি' অথবা 'ডি' হলেও তো সেই একই লক্ষণ। অথচ তাতে মানুষ কোনও কোনও সময় মারা যায়। সুতরাং কোন ধরনের জন্ডিস হয়েছে তা না বুঝতে পেরে মানুষ সব ধরনের জন্ডিসকেই ভয় পায়।

৪। চিকিৎসকদের একাংশও হয় নিজেদের অজ্ঞতার জন্য নয়তো ব্যবসার খাতিরে রোগীর বাড়ির লোকেদের ভয় দেখিয়ে রাখেন।

তবে একটা কথা, যদি জন্ডিসের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বেশি জ্বর হতে থাকে এবং সেই জ্বর বেশিদিন স্থায়ী হয়, তবে তা ভাইরাল হেপাটাইটিসের বদলে অন্য রোগ হতে পারে। তখন হেপাটাইটিসের প্রকার জানার জন্য পরীক্ষা করা উচিত এবং যদি কোনও ভাইরাস ধরা না পড়ে তা হলে রোগীকে দরকার পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি (আমাদের উচ্চারণে ডেঙ্গু), লেপ্টোস্পাইরোসিস বা অন্যান্য রোগের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা উচিত।

চিকিৎসক ঠিক দেখছেন তো?

চিকিৎসকদের অজ্ঞতার বা অবহেলার একটা উদাহরণ দিই। আমার কাছে একটা আন্তর্জাতিক মানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক প্রফেসর এসে বললেন যে তাঁর ছ'মাস ধরে জন্ডিস সারছে না। তাঁকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখলাম যে তাঁর শুরুতে একবার একটু পেট খারাপ আর বমি হয়েছিল আর দু একদিনের জন্য ক্ষিদে কমেছিল। তার পর থেকে আর কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবু, যিনি কলকাতার একজন নামকরা গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, তিনি সমানে তাঁকে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে চলেছেন আর বিলিরুবিন না কমার ফলে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে চলেছেন। আমি প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কোনও নিকট আত্মীয়ের কি কখনও এরকম হয়েছিল? প্রফেসর লাফিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, আমার দিদিরও ঠিক একই সমস্যা। আমি তাঁকে বললাম, আপনি দ্রবণীয় আর অদ্রবণীয় এই দু'ধরনের বিলিরুবিন টেস্ট করিয়ে আসুন। দেখা গেল, তাঁর অদ্রবণীয় বিলিরুবিন বেড়ে রয়েছে, দ্রবণীয় বিলিরুবিন নয়। এটা কোনও অসুখ নয়, অনেকের লিভারে জন্মগতভাবে অদ্রবণীয় বিলিরুবিনকে দ্রবণীয় বিলিরুবিনে পরিণত করার এনজাইমটা কম থাকে। ফলে তাঁদের রক্তে সারাজীবন অদ্রবণীয় বিলিরুবিন বেশি থাকে। জ্বর-জ্বালা হলে তা আরও বেড়ে যায়। ডাক্তারবাবু যদি এই ব্যাপারটা মাথায় না রাখেন, আর শুধু মোট বিলিরুবিনের পরীক্ষা করিয়ে যান, তবে তিনিও ভুগবেন, রোগীও ভুগবে। দু'রকম বিলিরুবিনের পরীক্ষা করলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। এটা একটা সাধারণ ভুল, যা আমি অনেক রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঘটতে দেখেছি। এই মানুষদের চোখের রং সাধারণত একটু হলুদ হয়। এনাদের অবশ্য ঠিক 'রোগী' বলা চলে না। এই সমস্যাটির নাম হল 'গিলবার্ট সিনড্রোম'।

ইদানীং কিছু অসাধু চিকিৎসক এক ধরনের জন্ডিস নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে অর্থোপার্জন করছেন। তাই নিয়ে কয়েকটা কথা বলে লেখাটা শেষ করছি। এটা সাধারণ মানুষের জানার কথা নয় যে মায়ের পেটে থাকাকালীন আমাদের রক্তে যে হিমোগ্লোবিন থাকে, তা মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসার পর বদলে যায়। অর্থাৎ আমাদের এখনকার রক্তের হিমোগ্লোবিন আমাদের গর্ভাবস্থায় থাকার সময়কার রক্তের হিমোগ্লোবিনের থেকে আলাদা। এই পরিবর্তনটা ঘটে আমাদের জন্মের পর ৭ থেকে

১৪ দিনের মধ্যে। যেহেতু এই সময়ের মধ্যে শিশুর শরীরের সমস্ত হিমোগ্লোবিন ভেঙে গিয়ে নতুন হিমোগ্লোবিন তৈরি হয়, ফলে এই সময়ে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে যায়, কারণ হিমোগ্লোবিন ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি হওয়া একটি বর্জ্য পদার্থ হল বিলিরুবিন। এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা যা মানুষের সৃষ্টির সময় থেকেই চলে আসছে। কিছু ডাক্তারবাবু এই সময় শিশুর রক্তপরীক্ষা করান এবং স্বাভাবিক ভাবেই সেই সময় রক্তে খুব বেশি বিলিরুবিন পাওয়া যায়। তাঁরা তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে নার্সিং হোমে ভর্তি করান এবং চিকিৎসা হিসেবে তাই করেন, যা আমাদের ঠাকুরমা-দিদিমারা হাজার বছর ধরে করে আসছেন। তাঁরা শিশুটিকে কৃত্রিম আল্ট্রাভায়োলেট আলোর মধ্যে রাখেন যেখানে ঠাকুরমা তাকে সকালের রোদের আল্ট্রাভায়োলেট আলোর মধ্যে রাখতেন। এই আলো বিলিরুবিনকে নির্বিষ পদার্থে পরিণত করে দেয়। এমনিতেও এই বিলিরুবিন সাত আট দিনের মধ্যে নিজে থেকেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপব্যবহার করে কিছু মানুষ লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করে, যেমন করে দৈবী চিকিৎসকরা মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে করে থাকে।

তবে নবজাত শিশু যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ডিস নিয়ে জন্মায়, সেটা অন্য ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে তার শরীরে কোনও রোগের ফলে এ রকম হয়েছে। আর রোগ ছাড়া অন্য একটি কারণে এরকম হতে পারে। যদি শিশুর মায়ের রক্ত Rh-নেগেটিভ গ্রুপের আর বাবার রক্ত Rh-পজিটিভ গ্রুপের হয় আর তাঁদের মিলনে প্রথম শিশুটি যদি Rh-পজিটিভ গ্রুপের রক্ত নিয়ে জন্মায়, তবে তার নাড়ি কাটার সময় তার রক্ত মায়ের শরীরে মিশে গিয়ে মায়ের শরীরে Rh-পজিটিভ গ্রুপের রক্তের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যেতে পারে। এর পর দ্বিতীয় শিশুও যদি Rh-পজিটিভ গ্রুপের হয়, তবে তার গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরের থেকে সেই অ্যান্টিবডি শিশুর শরীরে প্রবেশ করে তার রক্তের লোহিতকণিকাগুলোকে ভেঙে দেবে। ফলে সেই শিশু হয় মৃত অবস্থায় জন্মাবে অথবা গাঢ় জন্ডিস নিয়ে জন্মাবে এবং জন্মের কিছুকাল পরেই মারা যেতে পারে। এর জন্য প্রথম গর্ভধারণের সময় মাকে একধরনের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঐ অ্যান্টিবডিকে প্রশমিত করে দেওয়া হয়, যাতে গর্ভস্থ শিশুটার ক্ষতি না ঘটে। Rh-গ্রুপের দিক থেকে ছাড়াও মা-বাবার রক্ত ABO গ্রুপের দিক থেকে না মিললেও এই সমস্যা হতে পারে, তবে তা সাধারণত অতটা ক্ষতিকর হয় না। তবে বিয়ের সময় ঠিকুজি-কুষ্ঠি না মিলিয়ে রক্তের গ্রুপ মেলালে আর কোনও ঝামেলা থাকে না।

এই হল ''কেস জন্ডিস''-এর সার কথা। আশা করি, এটুকু জানলেই আমরা জন্ডিসের আতঙ্ক কাটিয়ে তার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারব। তারপর যদি অবস্থা বেশি জটিল হয়, তার জন্য তো বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রয়েইছেন। সুতরাং অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

With Best Complements from :

KLM

www.klmlab.com

KLM LABORATORIES PVT. LTD.

An ISO 9001 2008 Certified Company

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

২০১২-ডিসেম্বর থেকে তর্ক-বিতর্ক চলছে সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান নিয়ে। বর্তমান রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপকে জনমুখী প্রতিপন্ন করতে চাইছেন, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের বিরোধিতা করছে ওষুধের দোকানিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বিসিডিএ, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের ধারণার নানান ফাঁক-ফোকর দেখিয়ে দিচ্ছেন চিকিৎসকদের অনেকে...। ২১ শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০,০০০ ওষুধের দোকান ধর্মঘট হয়ে গেল বিসিডিএ-র ডাকে, ওষুধের দোকানিদের মিছিলে-মিছিলে সে দিন মধ্য-কলকাতা অচল।

সাত দফা দাবি নিয়ে বিসিডিএ-র আন্দোলন ঃ—

১। ওষুধ নীতি প্রণয়ন, ওষুধের মূল্য হ্রাস ও সমস্ত ওষুধের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা।
২। ফার্মাসিস্ট সমস্যা মেটাতে হবে।
৩। ফেয়ার প্রাইস শপ তৈরির সরকারি সিদ্ধান্ত পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।
৪। জনসংখ্যা এবং জনবসতির আনুপাতিক হারে ড্রাগ লাইসেন্স দিতে হবে।
৫। ওষুধের ওপর থেকে সব ধরনের কর প্রত্যাহার।
৬। ক্যান্সার সহ সমস্ত রকম জীবনদায়ী ওষুধের বিক্রয় মূল্যকে ঘিরে ফাটকাবাজি বন্ধ করতে হবে।
৭। ওষুধের বিক্রয়মূল্য দেশের সর্বত্র একই রকম করা হোক। তাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি কমবে।

বিসিডিএ সাতটা দাবির কথা বললেও তাঁদের আসল কথা— সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান খোলার বিরোধিতা।

পাশাপাশি আরেক ধরনের ঘটনা ঘটছে—মাঝেমাঝে এস এস কে এম-এ হানা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী। দেখছেন ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের অবস্থা, অন্য ওষুধের দোকানগুলো ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে কিছু ওষুধ কেনা রোগীদের বাকি ওষুধ বিক্রি করতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সরকারি ডাক্তাররা জেনেরিক নামেই যাতে কেবলমাত্র ওষুধ লেখেন তার জন্য সতর্ক করছেন। সতর্কীকরণ অগ্রাহ্য করায় শো-কজের চিঠি ধরানো হচ্ছে সরকারি ডাক্তারদের।

দৈনিক পত্রিকা-সাময়িক পত্রে বিষয়টার পক্ষে-বিপক্ষে কলম ধরেছেন চিকিৎসক ও গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা। মেডিকাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সংগঠন ন্যায্য মূল্যের ওষুধের

দোকান নিয়ে এক বিতর্ক-সভার আয়োজন করে।

বিতর্কে ঢোকার আগে দেশের কাছে ওষুধের উপলব্ধতা কতটা, ওষুধের মূল্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হয়, সে বিষয়গুলো একটু বুঝে নেওয়া দরকার। যদিও স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র আগের সংখ্যাগুলোতে আমরা বিভিন্ন সময়ে এ সব নিয়ে আলোচনা করেছি, তবু আরেকবার মনে করে নেওয়া।

দেশে প্রচুর ওষুধ উৎপাদিত হয়, তবু দেশের মানুষের জন্য ওষুধ নেই...

আমাদের দেশ পৃথিবীর বড় ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে একটা। ২০০৯-২০১০ সালে ৬২,০৫৫ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছে দেশের বাজারে আর ৪২,১৫২ কোটি টাকার ওষুধ রফতানি হয়েছে। উৎপাদিত ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বর। এই ফারাকের কারণ হল আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম, তাই মোট আয়তন বেশি হলেও মোট দাম কম।

এত উৎপাদন সত্ত্বেও আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না। চিকিৎসার মোট খরচের ৭০% থেকে ৮০% জুড়ে থাকে ওষুধের দাম আর চিকিৎসার খরচ যোগাতে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যায় রোগীর পরিবার।

বর্তমানে ভারতে ওষুধের মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে

স্বাধীনতার ৩২ বছর পর ১৯৭৯-এ প্রথম ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি ভূমিকা দেখা যায়। সব ওষুধগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় চারটে শ্রেণীতে এবং লাভের সীমা স্থির করে দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণিতে জীবনদায়ী ওষুধগুলোকে রাখা হয়, যেখানে লাভের উর্ধ্বসীমা ৪০%। দ্বিতীয় শ্রেণিতে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ, লাভের উর্ধ্বসীমা ৫৫%। অন্যান্য ওষুধ তৃতীয় শ্রেণিতে, লাভ করা যায় ১০০% অবধি। নতুন ও বাকি সব ওষুধকে রাখা হয় চতুর্থ শ্রেণিতে, যেখানে লাভের উর্ধ্বসীমা নেই।

মনে করা হয়েছিল এই শ্রেণিবিভাগের ফলে জনসাধারণ জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ কম দামে পাবেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ কোম্পানিগুলোর যে কম লাভ হবে তা তারা পুষিয়ে নেবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ওষুধ কোম্পানিগুলো জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরি কমিয়ে দিয়ে তৈরি করতে লাগল টনিক-কাশির সিরাপের মতো অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। যক্ষ্মা-কুষ্ঠের ওষুধের মতো দরকারি ওষুধ অমিল হতে থাকল।

'৯০-এর দশকের আরম্ভে শুরু হল অর্থনীতির উদারীকরণ, শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত হল, ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হল। কোন ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা হবে তা ঠিক করা হতে লাগল বাজারে ওষুধের মোট বিক্রিতে বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর অংশের ভিত্তিতে। এই জটিল হিসেবটা না বুঝে জেনে নেওয়া যাক একটা তথ্য—বর্তমানে ৭৪টা ওষুধের কাঁচা মাল বা বাল্ক ড্রাগ এবং সেগুলো থেকে তৈরি ১৫৭৭টা ফর্মুলেশন মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায়।

সম্প্রতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশে এক বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠী ২০১১-র অত্যাবশ্যক ওষুধের

জাতীয় তালিকায় থাকা ৩৪৮টা ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু যে জটিল হিসেবে তাঁরা দাম নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে ওষুধের দাম কমার বদলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

এমন এক পরিস্থিতিতে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান রাজ্যের অন্তত কিছু মানুষের কাছে ওষুধকে পৌঁছে দেবে এমনটা আশা করছেন অনেকে। আশাটা অমূলকও নয়, সরকারি হাসপাতালে দেখান নি এমন রোগীরাও অনেকে ওষুধ কিনছেন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে।

সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের দোকান : স্বাস্থ্য-দফতরের ভাবনা

২০১২-র জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' আহ্বান করে ৩৫ পাতার এক দলিল প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য নির্বাচিত কিছু সরকারি হাসপাতালে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা, যেখানে ওষুধ, চিকিৎসায় ব্যবহার্য সামগ্রী (consumables) এবং শরীরে স্থাপনযোগ্য সামগ্রী (implants) সর্বোচ্চ খুচরো দামের চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করা হবে।

যে সব হাসপাতালে এই সব ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হবে বলা হয়, তার মধ্যে রয়েছে—কলকাতার ৫টা মেডিকাল কলেজ-সহ মোট ৬টা হাসপাতাল; দার্জিলিং জেলায় নর্থ বেঙ্গল মেডিকাল কলেজ সহ ৩টে হাসপাতাল; উত্তর ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে মেডিকাল কলেজ সহ ২টো করে হাসপাতাল; নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি, বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুরের ২টো করে হাসপাতাল; মালদার মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল; হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ১টা করে হাসপাতাল। অর্থাৎ মোট ৩৫টা হাসপাতালে। এখনও অবধি ৩২টা দোকান খোলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন কিছু দিনের মধ্যে সংখ্যা দাঁড়াবে ৫২-এ।

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে কী কী পাওয়া যাওয়ার কথা?

- ১৪২ টা ওষুধের জেনেরিক নামে এক তালিকা দেওয়া হয়েছে যে সব ওষুধ দোকান থেকে বিক্রি করতে হবে। পরে এই তালিকায় আরও ওষুধ যোগ করতে পারে স্বাস্থ্য দফতর। ওষুধের MRP (সর্বাধিক খুচরো দাম)-এর ওপর ৩০% এর বেশি ছাড়ে ওষুধ বিক্রি করতে হবে।
- বলা হয়েছে জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের উল্লিখিত অন্য কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সামগ্রী যদি ১৪২-এর তালিকায় বাদ পড়ে থাকে তাহলে তাও পাওয়া যাবে এ দোকানে।
- পাওয়া যাবে ক্যানসার-বিরোধী ওষুধ।
- Consumables / Surgicals / Disposables / Dressing Materials ৩৯ রকম পাওয়া যাবে।
- পাওয়া যাবে অর্থোপেডিক্সে ব্যবহৃত নানান সামগ্রী ও ইমপ্ল্যান্ট।
- হৃদরোগ চিকিৎসায় ব্যবহার্য নানা রকম পেস-মেকার ও স্টেন্ট পাওয়া যাবে।
- পাওয়া যাবে ইমিউনলজিক্যাল নানা ওষুধ।
- এ সব দোকানে বাচ্চাদের ব্যবহার্য পাউডার, সাবান, শ্যাম্পু, ক্রিম, লোশন, তেল ও মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি করা যাবে।
- বলা হয়েছে এখান থেকে বেবিফুড বা ইনফ্যান্ট ফুড বিক্রি করা যাবে না, কিন্তু ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে হেলথ্ ড্রিংক ও পুষ্টিপরিপূরক (nutritional supplements) গুলোকে, যেগুলো বেবি ফুড-ইনফ্যান্ট ফুডের মতই অপ্রয়োজনীয়, প্রস্তুতকারী কোম্পানির মুনাফা বাড়ানো ছাড়া যেগুলো কোনও কাজে লাগে না।
- একটা ভাল বিষয় হল — নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নানা সময়ে কেন্দ্রীয় ওষুধ মহা নির্দেশক দ্বারা নিষিদ্ধ ৭৬ ধরনের ওষুধ, এ সব দোকান থেকে বিক্রি করা যাবে না।

১৪২-এর তালিকা ঘেঁটে দেখা গেল—

- ১৪২-এর তালিকায় দু'বার করে উল্লেখ করা হয়েছে— ভিটামিন কে$_3$, পভিডোন আয়োডিন সল্যুশন, পভিডোন আয়োডিন মলম, রিংগার'স ল্যাক্টেট দ্রবণ, এড্রেনালিন ইঞ্জেকশন, ডোপামিন ইঞ্জেকশন, অক্সিটোসিন ইঞ্জেকশন, সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ইঞ্জেকশন, প্যারাসিটামল সিরাপ— মোট ৯টা ওষুধকে। অর্থাৎ আসলে ১৪২ নয়, তালিকা ১৩৩টা দ্রব্যের।
- তার মধ্যেও একই ওষুধের বিভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন রূপ (বড়ি / ক্যাপসুল / সিরাপ / ইঞ্জেকশন, ইত্যাদি) আছে।
- তালিকা শুরু হয়েছে অযৌক্তিক ব্যথার মলম এসিক্লোফেনাক জেল দিয়ে।
- তালিকায় যে সব অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ (fixed dose combinations) পাওয়া গেল, সেগুলো হল—এমোক্সিসিলিন ও ক্লক্সাসিলিনের মিশ্রণ, কাফ সিরাপ, লোসারটান ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইডের মিশ্রণ, রেবিপ্রাজোল ও ডমপেরিডনের মিশ্রণ — মোট ৬টা (ওষুধ বিজ্ঞান সাধারণত নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ ব্যবহারের বিপক্ষে কেন না— এদের একটা ওষুধের মাত্রা স্থির রেখে অন্যগুলোর মাত্রা কমানো বাড়ানো যায় না, সাধারণভাবে এগুলোর দাম আলাদা আলাদা ওষুধের মোট দামের চেয়ে বেশি, এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আলাদা আলাদা ওষুধের মোট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি)।
- তালিকায় এমন সব ওষুধ আছে যেগুলো এখন আর ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে, ভাল বা নিরাপদ বিকল্প আছে অথবা অপ্রয়োজনীয় বলে, যেমন— নিফিডিপিন ক্যাপসুল, এম্পিসিলিন ৫০০ মিগ্রা ক্যাপসুল, ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন সাইট্রেট সিরাপ।
- তালিকাটা ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল আসলে মাত্র ৯০টা কাজের ওষুধ আছে ১৪২-এর এই তালিকায়। ভারতের সাম্প্রতিকতম অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় ৩৪৮টা ওষুধ আছে। এই ৯০টা কাজের ওষুধের মধ্যে মাত্র ৬৮টা জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকাভুক্ত। অর্থাৎ ২৮০টা বা ৮০.৪৫% **অত্যাবশ্যক ওষুধ আমরা এ সব ন্যায্য মূল্যের দোকানে পাব না।**
- পাব না জীবাণুনাশক কোট্রাইমোক্সাজোল, উচ্চ রক্তচাপ কমানোর হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ও এটেনেলল, ডায়াবেটিসের গ্লিবেনক্ল্যামাইড ও গ্লিপিজাইড, এমন কত কী!

সরকার কি আইন ভাঙায় প্রশ্রয় দিচ্ছে?

আইন অনুযায়ী ফার্মাসিস্ট ছাড়া ওষুধের খুচরো দোকান চালানো যায় না। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান খোলা থাকবে ২৪ ঘন্টা। ৮ ঘন্টা কাজের সময় ধরলে অন্তত তিন শিফটে তিন জন ফার্মাসিস্ট লাগে একেকটা দোকানে। নির্দেশিকায় কিন্তু দোকান-পিছু একজন ফার্মাসিস্ট ও অন্তত চারজন

সহায়কের কথা বলা হয়েছে, তার মানে হয় দিনে ১৬ ঘন্টা ফার্মাসিস্ট থাকবেন না অথবা ফার্মাসিস্টদের ৮ ঘন্টার বেশি সময় খাটানো হবে।

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ

স্বাস্থ্য দপ্তর কী দেবে?

- ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট অনুযায়ী ওষুধের পাইকারি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা দেবে ভাড়ার বিনিময়ে। যেখানে তৈরি জায়গা নেই, সেখানে তৈরি করে দেবে।
- ২৪ ঘন্টা বিনা মূল্যে জলের ব্যবস্থা করে দেবে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন করে দেবে। ব্যবসায়ীকে বিদ্যুৎ কোম্পানিকে বিল মেটাতে হবে।

ব্যবসায়ী কী করবেন?

- দোকান সাজাবেন।
- আলাদা বিদ্যুতের মিটার লাগাবেন।
- স্বাস্থ্য দফতরকে ঘর ভাড়া মেটাবেন।
- ব্যবসা চালানোর পুঁজি লাগাবেন।
- কর্মচারী ও সুরক্ষা কর্মী নিয়োগ করবেন।
- দোকান খোলা রাখতে হবে ২৪ ঘন্টা।

অর্থাৎ সরকারি জমিতে, সরকারি নানা সুবিধা ও মদতে ব্যবসা চালিয়ে মুনাফা লুটবে ব্যবসায়ী। সরকারি হাসপাতাল থেকে খদ্দেরও তারা পাবে বিনা আয়াসে।

যে ভাবে সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হচ্ছে তাতে ছোট ব্যবসায়ীর অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশঙ্কা

- মেডিকাল কলেজগুলোতে দোকান চালানোর আবেদন করতে গেলে খুচরো দোকানদারদের গত দু'বছর গড় বার্ষিক টার্ন ওভার কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা হতে হবে। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালের ক্ষেত্রে অন্তত ৬ কোটি টাকা।
- বর্তমানে যাদের ওষুধের পাইকারি ব্যবসা বা পরিবেশক ব্যবসা আছে তাদের গত দু'বছরে গড় বার্ষিক টার্ন ওভার হওয়া চাই মেডিক্যাল কলেজগুলোর জন্য আবেদন করতে গেলে অন্তত ১২ কোটি টাকা, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে অন্তত ৮ কোটি টাকা।
- বলা হয়েছে ব্যবসার পরিমাণ যার যত বেশি হবে, নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার তত সম্ভাবনা বাড়বে।
- ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি রূপে সিকিউরিটি অর্থ জমা রাখতে হবে। পুরনো মেডিক্যাল কলেজগুলোর ক্ষেত্রে কোনও কোনওটায় ৩০ লাখ, কোনও কোনওটায় ২০ লাখ। নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে ১০ লাখ টাকা। মহকুমা হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে ৫ লাখ টাকা।
- বার-কোডিং ও অপ্টিকাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।

এই ব্যবস্থায় ছোট ওষুধ দোকানি, পাইকারি বিক্রেতা বা সরবরাহক প্রতিযোগিতায় নামতেই পারবেন না। সরকারি জমিতে, সরকারের জোগানো খদ্দেরদের ওষুধ বেঁচে আরও ফুলে ফেঁপে উঠতে পারবে কেবল অ্যাপলো, ফ্র্যাংক রস প্রভৃতির মতো বড় বড় ওষুধের দোকানের চেন।

এ ছাড় আসলে কোনও ছাড়ই নয়

বর্তমানে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ৫১.০০ থেকে ৬৭.২৫% ছাড়ে ওষুধ বিক্রি করছে। হাসপাতাল ভেদে ছাড়ের মাত্রা আলাদা-আলাদা।

এস এস কে এম হাসপাতাল	৬৭.২৫%
মেডিকাল কলেজ	৬৬.২৫%
ন্যাশানাল মেডিকাল কলেজ	৫৬.৬০%
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকাল কলেজ	৫১.০০%
উত্তরবঙ্গ মেডিকাল কলেজ	৫১.০০%
মেদিনীপুর মেডিকাল কলেজ	৫১.০০%
এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল	৫৪.০০%
বারাসত জেলা হাসপাতাল	৬২.০০%
হাওড়া জেলা হাসপাতাল	৫৭.৩৬%
নদীয়া জেলা হাসপাতাল	৬০.৫০%
শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল	৫১.০০%

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ গরীব মানুষদের জন্য কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার কয়েকটা ক্লিনিক চালায়। হাওড়া জেলার চেঙ্গাইলে এদের ড্রাগ লাইসেন্সযুক্ত ওষুধের দোকানে কী দামে ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ কেনা হয়, কী বা তাদের MRP-উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

ওষুধের নাম	যে দামে কেনা হয় (টা.)	MRP (টা.)	মুনাফা কতটা হতে পারে? (টা.)	মুনাফা (%-এর হিসেবে) (টা.)
এমোক্সিসিলিন ২৫০ মিগ্রা ক্যাপসুর	১.২৯	৩.৯০	২.৬১	২০২.৩২%
এমোক্সিলিন ৫০০ মিগ্রা. ক্ল্যাভুলিনিক এসিড ১২৫ মিগ্রা ক্যাপসুল	৮.৬৫	৪১.৬৭	৩৩.০২	৩৮১.৭৩%
সেট্রিজিন ১০ মিগ্রা বড়ি	০.১৯	২.০০	১.৮১	৯৫২.৬৩%
ডমপেরিডন ১০ মিগ্রা বড়ি	০.২৫	৩.১০	২.৮৫	১১৪০%
গাবাপেন্টিন ১০০ মিগ্রা বড়ি	১.৫০	৪.২০	২.৭০	১৮০%
এমিট্রিপ্টিলিন ১০ মিগ্রা বড়ি	০.৩০	১.১০	০.৮০	২৬৬.৬৬%
এটেনেলল ৫০ মিগ্রা বড়ি	০.২২	২.১৫	১.৯৩	৮৭৭.২৭%
এম্লোডিপিন ৫ মিগ্রা বড়ি	০.৩০	২.২০	১.৯০	৬৩৩.৩৩%
এনালাপ্রিল ৫ মিগ্রা	০.৪৮	৩.০০	২.৫২	৫২৫%

যেখানে ১৮০% থেকে ১১৪০% লাভ হয় সেখানে ৪০-৭০% বা ৩০-৭০% ছাড় আসলে কোনও ছাড়ই নয়।

ন্যায্য মূল্যের দোকানে যে সব কোম্পানির ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো গ্রামীণ ডাক্তারদের কাছে পাওয়া যায় অনেক কম দামে—

জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	প্রস্তুতকারী কোম্পানি	বাজারজাত করছে	ছাপা দাম	যে দামে গ্রামীণ ডাক্তার কেনেন
এলবেন্ডাজোল	ABN	ম্যাস্কট, হরিদ্বার	নল	২২.৫০ টাকা (১টা বড়ির দাম)	৩.০০ টাকা (১টা বড়ির দাম)
এলবেন্ডাজোল	ZEEBEE ALU	সিনকম হেলথকেয়ার লিমিটেড, উত্তরাখন্ডন	র‍্যানব্যাক্সি	১৩.৭৮ টাকা (১টা বড়ির দাম)	২.৫০ টাকা (১টা বড়ির দাম)
ফ্লুকোনাজোল	FLUZOL 150	স্কাইম্যাপ, রুরকি	বায়োকেম	৩৮.০০ টাকা (১টা বড়ির দাম)	৪.০০ টাকা (১টা বড়ির দাম)
ফ্লুকোনাজোল	FLUCOBIG	বায়জেনেটিক, হিমাচল প্রদেশ বায়নাবায়ো	ইউনিকেম	৩২.০০ টাকা (১টা বড়ির দাম)	৪.৫০ টাকা (১টা বড়ির দাম)
সেটিরিজিন	CITIZD	ভেনাস বায়োসায়েন্সেস প্রাইভেট লি.	কন্সেপ্ট বায়োসায়েন্সেস (প্রাইভেট লি.)	৩৫.০০ টাকা (১০টা বড়ির দাম)	১.৫০ টাকা (১০ টা বড়ির দাম)

গ্রামীণ চিকিৎসকদের কাছে খবর পাওয়া গেল— এলাকার রোগীদের ক্রয়ক্ষমতা বিচার করে কেনা দামের ওপর তাঁরা যে লাভ রাখেন, তাতে এই ওষুধগুলোর দাম পড়ে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের তুলনায় অনেকটাই কম।

ওষুধের জেনেরিক নাম ও ব্র্যান্ড নাম

ওষুধের তিনটে নাম---রাসায়নিক নাম, জেনেরিক নাম বা আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম এবং ব্র্যান্ড নাম।

ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের আন্দোলনের যোদ্ধারা জেনেরিক নামের পক্ষে, কেননা—

- কেবলমাত্র জেনেরিক নামই চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপত্রে-পড়াশুনায় ব্যবহৃত হয়।
- বাজারে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণে তৈরী প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। জেনেরিক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানীগুলো বেশি সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন করতে বাধ্য হয়।
- ওষুধের নাম দেখেই সেটা কোন ধরনের ওষুধ বোঝা সহজ হয়। একই ওষুধের বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। জেনেরিক নাম ব্যবহারে সে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- জেনেরিক নামের ওষুধগুলোর দাম সাধারণভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে অনেকটা কম দামি।
- কেবল জেনেরিক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হয়, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হয় না।
- কেবল জেনেরিক নাম চললে ব্র্যান্ডের প্রচার-প্রসার করতে হয় না বলে খরচ কমে, ওষুধের দামও কমে।

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান কি চালাকি করছে?

অধিকাংশ ওষুধ জেনেরিক নামে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ব্র্যান্ডেড জেনেরিক রূপে---কোম্পানীর জেনেরিক ডিভিশনের উৎপাদন, যার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, যে নাম ডাক্তারদের কাছে প্রচার করা হয় না, যে নামে সরবরাহ করে হাসপাতাল বা অন্য প্রতিষ্ঠানে। একই ওষুধের ব্র্যান্ডেড জেনেরিক বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন MRP-তে বিক্রি করে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-তে আগে ওষুধ সম্পর্কে তথ্য জোগানোর এক নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট www.medguideindia.com সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে দুটো বহুল-ব্যবহৃত ওষুধের তথ্য দেখছিলাম—জ্বর ব্যথা কমানোর প্যারাসিটামল আর জীবাণুনাশক সিপ্রোফ্লক্সাসিন। ওয়েবসাইটে ১৫৩টা কোম্পানীর প্যারাসিটামল (৫০০ মিগ্রা)-এর তথ্য আছে। সবচেয়ে কম দামি জেনেরিক এসিকেম ল্যাবরেটরিস-এর, একটা বড়ির দাম ২২ পয়সা। সবচেয়ে বেশি দামি জেনেরিক ইউনিভার্সাল ড্রাগ হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এর, একটা বড়ি ৩ টাকা ৬৪ পয়সা। সবচেয়ে কম দামি ব্র্যান্ড কিন্তু সবচেয়ে কম দামি জেনেরিকের চেয়েও কম দামি— অ্যালবার্ট ডেভিড-এর Parazine, একটা বড়ি ১৫ পয়সা। ওয়েবসাইটে ৫৩১টা কোম্পানির সিপ্রোফ্লক্সাসিন (৫০০ মিগ্রা)-এর কথা আছে। সবচেয়ে কম দামের জেনেরিক ক্যাডিলা-র একটা বড়ির দাম ১ টাকা ৫৪ পয়সা। সবচেয়ে বেশি দামের জেনেরিক এগ্রন রিমেডিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর, একটা বড়ি ৬ টাকা ১৮ পয়সা। সবচেয়ে কম দামি ব্র্যান্ড সবচেয়ে কম দামি জেনেরিকের চেয়ে অনেক কম দামি আল্ট্রামেডিক্স-এর Ciplac, একটা বড়ি ৬০ পয়সা।

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলো বেশি দামের

ব্র্যান্ডেড জেনেরিকস স্টক করছে। তাতে ছাড় দিয়েও যা দাম দাঁড়াচ্ছে, তা অনেক কোম্পানির ব্র্যান্ডেড ওষুধের দামের চেয়েও বেশি।

সরকার ডাক্তারদের ব্র্যান্ড নাম লেখা বন্ধ করতে বলছেন

নতুন কথা নয়—মেডিকাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ২০০২ সালের কোড অফ এথিকস-এ বলেছে ডাক্তারদের যথাসম্ভব জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন লেখা উচিত। বিভিন্ন সময় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকারি ডাক্তারদের ব্র্যান্ড নাম ব্যবহার করতে বারণ করেছে।

প্রশ্ন ওঠে—তা হলে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ উৎপাদিত হচ্ছে কেন, বাজারে আসছে কেন? একদিকে সরকার ব্র্যান্ড নামের ওষুধ, অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রার মিশ্রণ, ক্ষতিকর ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করার লাইসেন্স দেবে আর ডাক্তারদের বলবে এ সব লেখা যাবে না—এমনটা হয় নাকি!

সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তেমনটা করত, যেমন করেছিল আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশের সরকার—অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রার মিশ্রণ (irrational fixed dose combinations), ক্ষতিকর ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ করে।

সরকার কী করতে পারে?

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বর্তমানের জিডিপির ১.৪% থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে অন্তত ২.৫% করলে সরকার সমস্ত নাগরিকের জন্য বিনা মূল্যে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও উচ্চ স্তরের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারে, তা হিসেব করে দেখিয়েছেন ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি-র নেতৃত্বাধীন পরিকল্পনা কমিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক উচ্চ স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল।

তাঁদের সুপারিশ—

- ❖ স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচের অন্তত ১৫% হোক ওষুধের জন্য, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধগুলো সরকারকেই কিনতে হবে।
- ❖ আয়ুর্বেদ, ইউনানী, সিদ্ধ, হোমিওপ্যাথির আলাদা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা করতে হবে, রাজ্যস্তরে তা কেন্দ্রীয় ভাবে কিনতে হবে।
- ❖ প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি (Standard Treatment Guidelines) অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন ও ডিসপেন্সিং করতে হবে।
- ❖ স্বচ্ছ টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে ওষুধ কিনতে হবে।
- ❖ ভাল গুণমানের জেনেরিক ওষুধ নিশ্চিত করতে

হবে।

- ❖ প্রত্যেক জেলায় গুদাম থাকবে।
- ❖ ওষুধ, টিকা ও পরীক্ষার সরঞ্জাম কেনার জন্য স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা চাই।
- ❖ ওষুধের গুণবত্তা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি নথিভুক্ত করতে হবে।
- ❖ দ্রুত দাম মেটানোর ব্যবস্থা চাই।

তাঁদের মতে ওষুধ মানুষের নাগালে আনতে—

- ● ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- ● জাতীয় ও রাজ্যস্তরে ওষুধ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন করতে হবে।
- ● ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ যন্ত্রককে ক্ষমতা দিতে হবে।
- ● ফার্মাসিউটিকাল দফতরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে দেওয়া হোক।

কেন্দ্র সরকারই বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ মানে নি। রাজ্য সরকারেরও দায় নেই মানার।

রাজ্য সরকার কী করতে পারে?

❖ প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ডিসপেনসারী ঘর রয়েছে, রয়েছেন সরকারি ফার্মাসিস্ট ও তাঁর সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পরেন এমন কর্মী। সরকার নিজেই দোকান চালাতে পারত। (অবশ্য ন্যায্য মূল্যের দোকানের পক্ষধররা বলছেন—কীভাবে হবে, ৩৪ বছরের বাম সরকারের আমলে নতুন ফার্মাসিস্ট নিয়োগ হয়নি, অনেক পদই নাকি খালি। তা যদি হয়, তাহলে সরকার ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করলেই পারেন, কিছু বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানও হয়!)

❖ আগে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা খুচরো দোকান কী দামে কেনে তার উদাহরণ। পাইকারি বিক্রেতা কেনে আরও অনেক কম দামে। সরকার সে দামে বা বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক দাম (institutional price)-এ ওষুধ কিনে সামান্য মার্জিন রেখে অনেক কম দামে রোগীদের ওষুধ দিতে পারে, যদি সে সত্যি সত্যি জনসাধারণের উপকার করতে চায়।

সরকারি উদ্যোগের সমর্থক যাঁরা, তাঁরা বলছেন—সরকার নিজে ওষুধ বেচা শুরু করলে দুর্নীতির উৎসমুখ খুলে যাবে। সরকারি কর্মচারীরা নানা স্তরের দুর্নীতিতে লিপ্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথাই বলার—সরকারি উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠান তুলে দিয়ে বেসরকারিকরণের প্রবক্তারা কিন্তু এই একই যুক্তি হাজির করেন।

পরিশেষে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার—ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কোন অভিনব জনমুখী উদ্যোগ নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ভিশন ২০১৫-এ সবার জন্য ওষুধের যে স্লোগান দেওয়া হয়েছে—তাতেই আছে এই ধরনের উদ্যোগের ভাবনা। রাজস্থানে এই ধরনের দোকান চলছে অনেক দিন ধরে। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য হয়নি, ২০১৫-এর মধ্যে সবার জন্য ওষুধও হবে না, যত হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকানই খোলা হোক না কেন।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথা বললাম, তার সংখ্যাগরিষ্ঠ রোগী খেটে খাওয়া মানুষ, কেবল কমদামে ওষুধ নয়—ডাক্তার দেখানো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই হয় কম খরচে। তবু গরিব রোগীদের অধিকাংশ পুরো পরিষেবা কিনতে পারেন না। কম দাম নয় বিনা মূল্যেই সমাধান। রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব না নিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওষুধ অধরাই থেকে যাবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস। শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সব সময়ের জেনারেল ফিজিসিয়ান ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মী।

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

জনমুখী প্রকল্প না নিছক ভাঁওতাবাজি?

বিগত ছয় মাসে রাজ্য সরকার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ-সহ নানা জেলা ও মহকুমা হাসপাতলে যৌথ উদ্যোগে চালু করেছেন অনেকগুলো Fair Price Shop, বাংলায় বললে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান। তাই নিয়ে বিভিন্ন মহলে চাপান-উতোর চলছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী? লিখছেন **ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত**

২০১২ সালের জুন মাসে বেসরকারি ওষুধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর দরপত্র (tender) আহ্বান করে, যেখানে সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে কেবলমাত্র জেনেরিক ওষুধ বা অবাণিজ্যিক নামের (International Non-Proprietory Name) ওষুধ বিক্রি করা হবে। কেন এই ধরনের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান? এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ওষুধ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজ্যের স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়বরাদ্দের এক প্রধান অংশ যায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনা মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করতে। বিগত বছরে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারি হাসপাতালে যে সব রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসেন, তাদের সবার কাছে অনেক ওষুধই পৌঁছে দেওয়া যায় না। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রকাশিত নথিতে বলা হয় ... ''... The DOHFW [Department of Health & Family Welfare] is still confronted with the issue of greater access to good quality of medicines by the people at affordable cost as well as organised supply and delivery system, to cater for the need of the people at all levels...''। স্বাস্থ্য দফতরের ওই নথিতে এই ধরনের দোকানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, সরকারি হাসপাতালে অন্দরবিভাগ ও বহির্বিভাগে বিনা মূল্যে যে ওষুধ সরবরাহ তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু হাসপাতালের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে যে সব রোগীরা বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কেনেন, সেই সব দোকানের পণ্যদ্রব্যের মূল্য এবং গুণমানের ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। রোগীরা এর ফলে বহু ক্ষেত্রেই প্রতারিত হন— অনেক বেশি দাম দিয়ে বা নিম্নমানের ওষুধ কিনে। তা বন্ধ করার জন্যই এই উদ্যোগ। শুধু ওষুধ নয়, চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়, এমন অন্যান্য জিনিসপত্র যাদের consumables (কনজিউমেবলস— যেমন গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি) বলা হয় এবং নানা প্রতিস্থাপনযোগ্য বস্তুও (Implants) ও এর মধ্যে পড়ছে। থাকছে হার্টের পেসমেকার এবং স্টেন্টও।

হাসপাতালের চারপাশের ওষুধের দোকানগুলোর ৬০-৭০% বিক্রয়ের উৎসই হল সরকারি হাসপাতালের রোগীরা। কিন্তু ওই সব দোকান কী দামে, কী ব্র্যান্ড (Brand)-এর ওষুধ বিক্রি করছে, সে ব্যাপারে হাসপাতালের কোনও নির্দেশনামা কার্যকর নয়। ফলে সরকার দরপত্রের মাধ্যমে হাসপাতালগুলোতে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চালু করতে চান নিম্নলিখিত শর্তে :

১। ওষুধের দোকানগুলোর জন্য সরকারি হাসপাতালে জায়গা ও জলের সংযোগ দেওয়া হবে, নির্ধারিত মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং আর সব খরচ বিক্রেতার।

২। দোকানগুলিতে ১৪২টা তালিকাভুক্ত ফর্মুলেশন-এর ওষুধ বিক্রি করতে হবে জেনেরিক নামে অর্থাৎ মূল বৈজ্ঞানিক নামে। যেমন মেট্রোনিডাজোল (Metronidazole) ভিন্ন কোম্পানির দেওয়া নিজস্ব ব্র্যান্ড নাম (Brand Name) চলবে না। যেমন ফ্ল্যাজিল, মেট্রোজিল, মেট্রন এইসব নাম চলবে না। এখানে উল্লেখ করি যে জেনেরিক (International Non-Proprietory Name) ওষুধের দাম কোম্পানীর নিজস্ব নামের ওষুধের চেয়ে অনেক কম। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্র ১০% বা ২০%। ওই একই ওষুধ মালিকানাভুক্ত ব্র্যান্ড-নামে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হয় নিম্নলিখিত কারণে :

(ক) উৎপাদন খরচের ওপর কোম্পানির বিপুল মুনাফা থাকে, কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার শতাংশ।

(খ) সর্বোচ্চ খুচরো বিক্রয়মূল্য (MRP) দশ, পঞ্চাশ, একশো গুণ বা তারও বেশি বাড়িয়ে লেখা থাকে ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, স্টকিস্ট, পরিবেশক বা ওষুধের দোকানদারকে বিপুল কমিশন দিতে।

(গ) ওই দামের মধ্যে থাকে বাণিজ্য প্রতিনিধি (Medical Representative)-দের বেতন ও কমিশন, প্রচারের খরচ, বৈজ্ঞানিক আলোচনার নামে (Scientific Seminar) পাঁচতারা হোটেলে ডাক্তারবাবুদের ককটেল পার্টির আপ্যায়নের ব্যয়, রাজনৈতিক দলের চাঁদা ইত্যাদি।

(ঘ) চিকিৎসকদের উৎকোচের খরচ—নানা ধরনের বৈদ্যুতিন সম্ভার থেকে গহনা, স্বদেশে-বিদেশে ভ্রমণ থেকে বিলাসবহুল গাড়ি, গৃহস্থালীর টুকিটাকি জিনিস থেকে পুত্রকন্যার কলেজের বেতন। অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের প্রেসক্রিপশন করার 'যোগ্যতা' অনুসারে। এই সব খরচ মেটান হতভাগ্য রোগী।

৩। ১৪২টা ওষুধ ছাড়াও চিকিৎসায় ব্যবহৃত নানা ধরনের প্রতিস্থাপনের উপকরণ ও অন্যান্য উপাদানও (Implants and Consumables) পাওয়া যাবে। হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার এবং স্টেন্টও মিলবে। এই তালিকায় নেই এমন ওষুধপত্রও ব্র্যান্ডনামে বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া 'জননী সুরক্ষা যোজনা'র (JSSK) ব্যবহৃত সব ওষুধ রাখতে হবে।

৪। সমস্ত পণ্যের ওপর (জেনেরিক অথবা ব্র্যান্ডেড) বিক্রেতাকে সর্বনিম্ন ৩০% ছাড় দিতে হবে খুচরো বিক্রয়মূল্যের (MRP) উপর। দরপত্র খোলার পর সর্বোচ্চ ছাড় যিনি দেবেন, তিনিই নির্বাচিত হবেন। উল্লেখ করি, যে সব দোকানগুলো ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, সেখানে সর্বনিম্ন ৫১% থেকে সর্বোচ্চ ৬৭.২৫% (এস.এস.কে এম হাসপাতালে) ছাড় মিলছে রোগীদের।

৫। এই ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে যে সব ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যেত (CMS), তা অব্যাহত থাকবে। অতএব ওই দোকান চালু করে সরকার বিনা পয়সার ওষুধ দেওয়া থেকে হাত গুটিয়ে নেবে, এই আশঙ্কা অমূলক। কোনও নিষিদ্ধ ওষুধ (Banned drug) রাখা যাবে না।

৬। দোকানগুলো চলবে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা এবং বছরে ৩৬৫ দিন। West Bengal Drug & Cosmetic Act অনুসারে সমস্ত শর্তপূরণ করে বিক্রেতাকে লাইসেন্স (Drug Licence) নিতে হবে। চুক্তি চার বছরের জন্য। সরকারের পর্যবেক্ষণ কমিটি (Monitoring Cell) দৈনন্দিন কাজকর্ম খতিয়ে দেখবে, কোনও বে-আইনি বা অনৈতিক কাজ করলে চুক্তি খারিজ হয়ে যাবে। প্রতি মাসে বিক্রেতা কোম্পানি সরকারকে রিপোর্ট দেবে। ঠিকমতো পরিষেবা না দিলে, বেশি মূল্য নিলে, নির্ধারিত ছাড় না দিলে, Drug and Cosmetics Act ভঙ্গ করলে, মেয়াদ উত্তীর্ণ বা নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রি করলে, যোগ্যতাহীন কর্মীকে দিয়ে কাজ করালে, মজুত ওষুধ ও হিসাবে কারচুপি করলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আরও অনেক ধারা উপধারা আছে ৩৫ পাতার নথিটিতে, তবে এই হলো তার চুম্বকসার।

তীব্র দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া

গত ডিসেম্বর মাসে এম.আর.বাঙ্গুর হাসপাতালে প্রথম ন্যায্য মূল্যের দোকানটি চালু হবার আগে থেকেই খুচরো ওষুধ ব্যবসায়ীদের 'সর্ববৃহৎ' সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বা বিসিডিএ মারমার করে আসরে নেমে পড়ে। আর পাঁচটা এলেবেলে দাবির মুখোশের আড়ালে তাদের প্রধান দাবি হল, সরকারি হাসপাতালে এই সব অল্প মূল্যের জেনেরিক ওষুধের দোকান চালু করা চলবে না, কেননা তাতে তাঁদের সমিতিভুক্ত দোকানগুলোর ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে।

সম্পূর্ণ অনৈতিক হলেও বিসিডিএর পক্ষে এই বিরোধিতা করা স্বাভাবিক—কারণ তাদের মুনাফার ঘাটতি পড়বে। কিন্তু অতি আশ্চর্য ঘটনা হল, সরকারি চিকিৎসকদের একাংশ ওষুধ ব্যবসায়ীদের সাথে হাত মিলিয়ে, প্রথম থেকেই একটি বিশেষ কর্পোরেট সংবাদপত্রকে মাধ্যম করে, হাসপাতালের রোগীদের কম দামে জেনেরিক ওষুধ দেবার এই প্রচেষ্টাকে 'দ্বিচারিতা', 'ভন্ডামি', 'ভাঁওতাবাজি' প্রভৃতি চোখা চোখা বিশেষণে ভূষিত করতে থাকেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, এদের মধ্যে কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরেই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই প্রথম রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে জেনেরিক ওষুধের প্রচার নিয়ে নীতি গৃহীত হল ও সরকারি চিকিৎসকদের উদ্দেশে কড়া অনুশাসন জারি করা হল যে সব ব্যবস্থাপত্রে জেনেরিক ওষুধ লিখতে হবে। এক্ষেত্রে, আমাদের মতে, তাঁদের উচিত ছিল সরকারের নতুন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে, তারপর তার ভুলত্রুটিগুলো চিহ্নিত করা, সরকারের পর্যবেক্ষণ সমিতির (Monitoring Committee) কাছে নির্দিষ্টভাবে তাঁদের সুপারিশগুলো তুলে ধরা এবং ব্যবস্থাটা যাতে রোগী কল্যাণমূলক, দুর্নীতিহীন ও স্বচ্ছ হয়, তার জন্য মতামত প্রকাশ করা। তা না করে শিশুটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই তাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য তাঁরা কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমকে হাতিয়ার করে যে ধরনের 'আন্দোলন' আরম্ভ করলেন— তাতে ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হল সাধারণ মানুষের কাছে। এই বিসিডিএ-র সদস্যরা বহু বছর ধরে চূড়ান্ত বেশি দামে, বিপুল মুনাফা রেখে সাধারণ মানুষকে ওষুধ বেচেছেন। মাত্র এক বছর আগেই খুচরো ব্যবসায়ীদের ঐ সংগঠন সদস্যদের কাছে সার্কুলার পাঠায় যে কোনো রোগীকে এক পয়সাও ছাড় দেওয়া যাবে না। এই বে-আইনি সার্কুলারের ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থা Competition Council of India ঐ খুচরা ওষুধ ব্যবসায়ী সংগঠনকে ৪৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। আজকের দরদী চিকিৎসকরা নিশ্চুপ ছিলেন। এম.আর. বাঙ্গুরে প্রথম দোকানটি খোলার পর ওখানকার দালালচক্র চিকিৎসকদের হুমকি দেয় ন্যায্যমূল্যের দোকানে রোগী পাঠালে তাঁদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হবে। বি.সি.ডি.এ. সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে হাজার হাজার রোগীকে পণবন্দি রেখে ২১ জানুয়ারি সব ওষুধের দোকানে রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট করে। সরকারি চিকিৎসকদের এই সংগঠন ও তার সাধারণ সম্পাদক তারও কোনও প্রতিবাদ করেন নি। এখন ওষুধের দোকান, ওষুধ কোম্পানি, বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সংগঠন, সরকারি হাসপাতালের দালালচক্র এবং কর্পোরেট সংবাদপত্রের (যাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস এই সব সংস্থার বিজ্ঞাপন) স্বার্থের সাথে প্রগতিশীল চিকিৎসকদের কণ্ঠস্বর ও স্বার্থ এক হয়ে যেতে দেখে শুধু বলতে পারি ''বড় বিস্ময় লাগে।''

সওয়াল ও জবাব

◆ **অভিযোগ ১ :**

ওষুধের দাম : প্রচণ্ড চাপে পড়ে খুচরো ব্যবসায়ীরা এবং তাদের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকরা বলছেন, এই সব ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলো আসলে Branded Generic ওষুধ বিক্রি করছে— অর্থাৎ বড় কোম্পানির তৈরি জেনেরিক ওষুধ, যার সর্বাধিক খুচরো বিক্রয়মূল্য প্রায় ব্র্যান্ডেড ওষুধের সমান অথচ লভ্যাংশ অনেক বেশি। ফলে ৬৭% ছাড় দিয়েও তাতে নাকি অনেক মুনাফা থাকছে। বিসিডিএ তাল দিয়ে বুক ঠুকে বলছেন— তারা আরও বেশি ছাড় দেবেন সাধারণ মানুষকে। দেখিয়ে দেবেন আরও কম দামে ওষুধ দেওয়া সম্ভব। প্রশ্ন হল— এত দিন তা করেন কি কেন? ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ বেচে পুরো লাভটাই তো চেঁচেপুছে বাড়ি নিয়ে গেছেন! ডাক্তারবাবুরাই বা এই সব 'রহস্য' রোগীদের জানাননি কেন? কেন দিনের পর দিন দামি ওষুধ লিখে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেছেন? কীসের বিনিময়ে? আর সর্বত্র কেবল Branded Generic বিক্রি করা হচ্ছে ন্যায্য মূল্যের দোকন থেকে, তা সম্পূর্ণ অনৃতভাষণ। নীতিতে

বা কর্মপদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করাই যাবে। কিন্তু স্নানের জলের সঙ্গে শিশুটিকেও বিসর্জন দেওয়া অথবা মাথাব্যথা সারাতে মাথাটাকেই কেটে ফেলা কেমন বিধান?

◆ **অভিযোগ ২ :**

অবৈজ্ঞানিক ওষুধ : অভিযোগ উঠেছে, ১৪২টা ওষুধের তালিকায় কয়েকটা মিশ্র ওষুধ (Fixed dose combination), অবৈজ্ঞানিক ওষুধ ও অকাজের ওষুধ আছে। কিন্তু এই তালিকা তৈরি করেছেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর ওষুধ বিজ্ঞান বিভাগের চার জন এবং মেডিসিন বিভাগের তিন জন প্রথিতযশা অধ্যাপক। সরকারের কোনও মন্ত্রী নন। তালিকায় যদি ভুল থাকে (অন্তত প্রতিবাদী বিশেষজ্ঞরা যদি তা মনে করেন), তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপযুক্ত নথিসহ প্রতিবেদন জমা দেওয়াটাই স্বীকৃত পদ্ধতি, যাতে ভবিষ্যতে তা সংশোধিত হতে পারে। খবরের কাগজে টক-ঝাল-মিষ্টি বিবৃতি দেওয়া নয়।

◆ **অভিযোগ ৩ :**

অসম্পূর্ণ তালিকা : মাত্র ৩৫টা সরকারি হাসপাতালে দোকান কেন? মাত্র ১৪২টা ওষুধ তালিকায় কেন?

স্বাস্থ্য দফতর স্পষ্ট করে জানিয়েছে, আপাতত ৩৫টা হাসপাতালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ধাপে ধাপে সমস্ত মেডিকেল কলেজ, জেলাসদর ও মহকুমা হাসপাতালে (২য় ও ৩য় স্তরের সব হাসপাতাল) এমন দোকান চালু হবে। আর ১৪২টা ফর্মুলেশন-এর সাথে ৩৯টা সার্জিকাল, ৩টে কার্ডিয়াক ও প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারের ৩টে জিনিস পাওয়া যাচ্ছে ওই সব দোকানে। এটা ন্যূনতম। ক্রমে সংখ্যাটা বাড়ছে, কলকাতার দু'টো মেডিকেল কলেজে ইতিমধ্যেই ৩৫০-র ওপর ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। আর চুক্তি মোতাবেক সমস্ত জিনিসের ৫১-৬৭% ছাড় দিতে দোকানগুলো বাধ্য, এমনকী তালিকা বহির্ভূত ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্ষেত্রেও। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ এস এস কে এমের ন্যায্য মূল্যের দোকানে ৬০,০০০ টাকার কোবাল্ট ক্রোমিয়াম স্টেন্ট মাত্র ১৯,৬৫০ টাকায় এবং ১, ১০,০০০ টাকার 'ড্রাগ ইলিউটিং স্টেন্ট' মাত্র ৩৬, ০২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

◆ **অভিযোগ ৪ :**

অপ্রতুল ফার্মাসিস্ট : দোকানগুলো ২৪ ঘন্টা খোলা থাকলেও মাত্র ১ জন পাশ করা ফার্মাসিস্টে কাজ চালাচ্ছে।

এটি সম্পূর্ণ অনৃতভাষণ। চুক্তিপত্রে পরিষ্কার লেখা আছে যে দোকানগুলোতে বর্তমান আইনের সব শর্ত মেনে লাইসেন্স নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। সমালোচকরা বরং অনুসন্ধান করুন, হাসপাতালের বাইরের বেসরকারি দোকানগুলোতে ক'জন পাশ করা ফার্মাসিস্ট থাকেন, না কি তাদের শংসাপত্র ভাড়া নিয়ে কাজ চালানো হয়।

◆ **অভিযোগ ৫ :**

'ন্যায্য মূল্য' বলা হচ্ছে কেন?

ন্যায্য মূল্য কে স্থির করল? উৎপাদন মূল্যের বদলে বাজারে দামের ভিত্তিতে ওষুধের মূল্য স্থির করা হচ্ছে কেন?

—প্রশ্নটা যথাযথ কিন্তু ভুল জায়গায় করা হচ্ছে। পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ রেল দফতরে পাঠাবার মতো। ওষুধের দাম স্থির করেন Drug Price Control Organisation (DPCO)— একটা কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা। তারাই Cost Based Pricing-এর জায়গায় Market Based Price-এর নীতি অনুসরণ করেন।

◆ **অভিযোগ ৬ :**

বড় ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা:

বিরোধীদের বক্তব্য : দরপত্র (tender) জমা দেবার যোগ্যতা করা হয়েছে বছরে ৮ থেকে ১২ কোটি টাকার ব্যবসা। Earnest Money হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে ৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা। এই ভাবে সরকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিচ্ছে। আবার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতা করছে। এটা ভয়ঙ্কর দ্বিচারিতা।

—যাঁরা এই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা প্রথমত সরকারি দরপত্রে আহ্বানের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (100% FDI) এর বিষয়টিও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেননি। নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো একটু বিবেচনা করে দেখুন।

(ক) সরকারি দরপত্রের ক্ষেত্রে বরাবরই ব্যবসার পরিমাণের উপরই নির্ভর করে উৎকর্ষ বা Quality বিচার করা হয়। এছাড়া অন্য কোনও পদ্ধতি নেই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত দরপত্রের ক্ষেত্রেই মোট কত টাকার ব্যবসা করেছেন, তা বিবেচ্য। মোট যত টাকার দরপত্র তার এক থেকে তিন শতাংশ ব্যাঙ্কে জমাও রাখতে হয় 'সিকিউরিটি' হিসাবে।

(খ) এর সঙ্গে খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগের কোনও সম্পর্ক নেই। ওষুধ ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০২ সালেই ১০০% বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। সে স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু এই সব ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলোর ঠিকা যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ওষুধের পাইকারি ব্যবসায়ী হতে পারেন, কিন্তু এই সব সংস্থায় ১% বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগও আছে, তার প্রমাণ কি কেউ দিতে পারবেন? বর্তমানে রাজ্যের রাজনৈতিক শাসকদল খুচরো ব্যবসায়ে ৫১% বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিরোধী। কিন্তু দেশীয় বড় পুঁজির বিরোধী বলে তারা কবে ঘোষণা করেছে? আর পাঁচটা রাজ্য সরকারের মতো তারাও তো দেশি পুঁজিকে রাজ্যে আহ্বানের চেষ্টাই ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। তা হলে দ্বিচারিতার অভিযোগ ওঠে কেন?

◆ **অভিযোগ ৭ :**

সরকার নিজে কেন ওষুধ বেচছেন না?

সমালোচকরা বলছেন সরকার নিজেই হাসপাতালগুলোতে দোকান চালিয়ে রোগীদের আরো বেশি সুবিধাজনক দরে ওষুধ দিতে পারতেন। তাঁরা এ বিষয়ে তামিলনাড়ুর উদাহরণ দিচ্ছেন।

আমার মতে এই যুক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব। প্রথমত তামিলনাড়ুতে সরকারি সংস্থা TN Medical Service Corporatonগড়ে উঠেছে ১৮ বছর ধরে। তাদের ২৫টা আধুনিক গুদামখানা (Warehouse) ও প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং কর্মচারী আছে। তারা নানা হাসপাতালও পরিচালনা করে। আর পশ্চিমবঙ্গে বিগত ৩ বছরে বিগত সরকারের সময় রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তলানিতে ঠেকেছিল। ৫৪% ফার্মাসিস্টের পদ খালি সরকারি হাসপাতালে। অধিকাংশ স্থানে বেলা দু'টোর পর বহির্বিভাগের ফার্মেসি বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে আলাদা করে

সরকারি ওষুধের দোকান কে চালাবে? আর একই জায়গা থেকে বিনা পয়সায় CMS ওষুধ বিতরণের পাশাপাশি অন্য ওষুধ বিক্রি হলে ব্যাপক দুর্নীতির সম্ভাবনা থেকে যায়। তখন অর্ধশিক্ষিত মানুষদের ভুল বুঝিয়ে বিনা পয়সার ওষুধের বিনিময়েও পয়সা নেওয়া হবে। ওষুধ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাও গত ৩৪ বছরে গড়ে ওঠেনি। এ সব রাতারাতি করা যায় না।

◆ **অভিযোগ ৮ :**

ওষুধ ছাড়া অন্য পণ্য কেন?

সমালোচকরা চিৎকার করছেন, ন্যায্য মূল্যের দোকানে health drink, baby food, স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি হচ্ছে কেন?

West Bengal Drug & Cosmetic Act-এ একটা ওষুধের দোকানে যা যা রাখা যায়, সবই এই সব দোকানে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারি নথি সমালোচকরা পড়ে দেখতে পারেন।

সংক্ষেপে এই হল তর্কবিতর্কের খতিয়ান। দিল্লির AIIMS-এর মডেলের অনুকরণে (যা বিগত ১৫ বছর সাফল্যের সাথে চলছে) এই ধরনের ওষুধের দোকান চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত সরকারি ডাক্তারদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত ব্যবস্থাপত্র (Prescription) জেনেরিক নামে লিখতে হবে। যাঁরা এই নির্দেশ লঙ্ঘন করবেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। সরকারি চিকিৎসকই সানন্দে বা চাপের মুখে অতি নিরানন্দে এখন জেনেরিক ব্যবস্থাপত্র লিখছেন। কথায় বলে Old habits die hard— এত দিনের অভ্যাস, বিশেষত দারুণ অর্থকরী অভ্যাস, কি সহজে ছাড়া যায়? তাই চোরাগোপ্তা ব্র্যান্ডেড ওষুধ লেখাও চলছে। ধরা পড়লে, 'ঐ যাঃ। ভুল হয়ে গেছে।' তবে কলকাতার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষেরা জানিয়েছেন, এখন প্রায় ৭০-৮০% জেনেরিক ওষুধ লিখছেন সরকারি চিকিৎসকরা। ভক্তিতে না হলেও ভয়ে। মানুষের মধ্যেও বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখান না, এমন বহু মানুষও ওষুধ কিনছেন ওই সব দোকান থেকে, দাম যাচাই করে, নিশ্চিত হয়েই কিনছেন তাঁরা। আপনার আত্মীয়, প্রতিবেশির মধ্যে খোঁজ করে দেখতে পারেন।

নতুন উদ্যোগে ভুল ত্রুটি থাকবেই। তা সংশোধন করতে হবে। গঠনমূলক পরামর্শ দিতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হন। অসাধু ব্যবসায়িরা উৎসাহ না পান। অন্তত এই প্রথম জেনেরিক ওষুধ নিয়ে সাধারণ মানুষ আলোচনা করছেন। জানতে চাইছেন, বিষয়টা কী। ওষুধ সংস্থাগুলোর রহস্যাবৃত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, চেতনা বাড়ছে। এটাই ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলোর প্রাথমিক সাফল্য।

লেখক পরিচিতি : ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, এমবিবিএস, এমডি, ডিসিপি, একটি কেন্দ্রিয় সরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

অনীক

অনীক' পত্রিকা ৪৮ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

মধুমেহ ও চোখ

ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগ বলতে আমরা যে সব সমস্যার কথা ভাবি, চোখের সমস্যা তাদের মধ্যে তেমন গুরুত্ব পায় না। অথচ ডায়াবেটিসে চোখের খুব ক্ষতি হতে পারে, অন্ধত্বও অসম্ভব নয়; এবং সময়ে চেষ্টা করলে এ সব ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রেই ঠেকানো যায় - লিখছেন **ডা. চন্দন বারি**।

মধুমেহ বা ডায়াবেটিস আমাদের অতি পরিচিত রোগ। ডায়াবেটিস হলে কেটে গেলে বা ঘা হলে তাড়াতাড়ি শুকায় না, বা রাতে ঘনঘন প্রস্রাব পায়। এগুলো হলে আমরা ভাবি হয়তো ডায়াবেটিস হয়েছে। কোনও অপারেশন করার আগে ডাক্তারবাবু যে সব পরীক্ষা করান, রক্তের শর্করা পরীক্ষা (Blood Sugar) সেই তালিকায় এক নম্বরে। কিন্তু আমাদের কি ধারণা আছে যে শরীরে ডায়াবেটিস দেখা দিলে সেটা চোখকেও আক্রমণ করতে পারে? যদিও বহু চিকিৎসকই ডায়াবেটিস হলে চোখ পরীক্ষার কথা বলেন, কিন্তু আমরা কি তাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি? সেই বিষয় নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

সাধারণত ৪০ বছরের কাছাকাছি সময়ে আমাদের কাছের জিনিস ভাল ভাবে দেখার জন্য চশমা (Presbyopic correction) লাগে। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সেটা আরও কম বয়সেই দরকার হতে পারে। আপনার চোখে চশমার দরকার ছিল না, হঠাৎ করে দেখা গেল আপনার প্লাস পাওয়ার চশমা লাগছে, বা বেশ ঘনঘন আপনার চশমার পাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে রক্তের শর্করা পরীক্ষা করলে ডায়াবেটিস ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যাঁরা মধুমেহ রোগে ভুগছেন তাঁদের কম বয়সেই ছানি (cataract) হবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে ছোট বয়েসে বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস, অর্থাৎ জুভেনাইল ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে খুব কম বয়সেই দু'চোখেই ছানি (snow flake cataract) দেখা দেয়। বড়দের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের ছানি (Posterior polar cataract or early onset of senile cataract) দেখা দেয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের গ্লকোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গ্লকোমা হলে চোখের ভেতরে যে রস থাকে, সেই রসের চাপ বেড়ে যায়। এতে চক্ষুস্নায়ু (অপটিক নার্ভ) ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকী দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে পারে। রোগীদের নিয়মিত ভাবে চোখের রসের চাপ (ইন্ট্রা-অকুলার প্রেসার) মাপা দরকার।

আমাদের খাদ্যাভ্যাস আর জীবনযাত্রার ধরন পরিবর্তন হওয়ার কারণে নতুন প্রজন্মে কম বয়সেই উচ্চ-রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস (মধুমেহ) রোগ দেখা দিচ্ছে। আমরা এখনই দেখলাম, আমাদের খুব কম বয়সে ছানি, চশমার পাওয়ার বাড়া ও গ্লকোমা— এগুলো বেড়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিস-ঘটিত রেটিনোপ্যাথি বেড়েছে। অর্থাৎ ডায়াবেটিসের ফলে চোখের ভেতরের স্নায়ুর স্তরে, বা রেটিনাতে, যে পরিবর্তন হচ্ছে তা অন্ধত্বের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাধারণভাবে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি নির্ভর করে কত বছর ধরে রোগী ডায়াবেটিসে ভুগছেন, এবং তাঁর রক্তের শর্করা কত ভাল ভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকছে, এই দু'টোর ওপর। রক্তের শর্করা কতটা ভাল ভাবে নিয়ন্ত্রণে আছে, সেটা বুঝতে গেলে রক্তের শর্করা মাপার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA_1C)-এর মাত্রা দেখা প্রয়োজন।

চোখ আমাদের দেহের একমাত্র অঙ্গ, সেখানে সরাসরি রক্ত নালিকা (artery & vein) দেখা যায় অপথ্যালমোস্কোপ (Ophthalmoscope) নামের যন্ত্রের সাহায্যে। ফলে নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করালে বোঝা যাবে, কখন রেটিনোপ্যাথি দেখা দিচ্ছে। অপথ্যালমোস্কোপ-এর সাহায্যে চোখের ভেতরে রেটিনা খুঁটিয়ে দেখলে রেটিনায় রক্তপাত ও রক্তনালীর নানা পরিবর্তন দেখা যায়। এ সবের উপস্থিতির ধরনের ওপর নির্ভর করে রেটিনোপ্যাথি কোন স্তরের— মৃদু, ভয়ানক, না কি মাঝামাঝি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক ম্যাকুলোপ্যাথি হয়। ম্যাকুলা হল চোখের ভেতরে একটা বিশেষ অংশ যার সাহায্যে আমরা সবচেয়ে ভাল ভাবে দেখতে পাই। ডায়াবেটিক ম্যাকুলোপ্যাথি হলে ম্যাকুলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে দৃষ্টিশক্তি (visual acuity) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে ক্ষেত্রে নানা জটিল পরীক্ষা (যেমন অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি, ডিজিট্যাল ফ্লুওরেসেন্ট অ্যানজিওগ্রাফি ইত্যাদি করার পর লেসার চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। তবে লেসার চিকিৎসাতেও সব সময় দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয় না। বেশ কিছু ক্ষেত্রে চোখের ভেতরে রক্তপাত হয় (vitreous haemorrhage)। সে ক্ষেত্রে রক্তপাত নিজে থেকে চোখের ভেতর শোষিত না হলে অপারেশন করাতে হতে পারে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে বিশেষ ধরনের 'রেটিনাল ডিটাচমেন্ট', অর্থাৎ রেটিনা বা চোখের স্নায়ুস্তর ছিঁড়ে যাওয়া, তাও হতে পারে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ডায়াবেটিসের ফলে আমাদের চোখের নাড়াচাড়ার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে যে সব স্নায়ু (III, IV এবং VI নং স্নায়ু) তাদের ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার জন্য চোখ ট্যারা হয়ে যায় এবং একটা জিনিসকে দু'টো দেখা (ডাবল ভিশান) হতে পারে।

চোখের পাতায় ঘনঘন 'আঞ্জনি' দেখা দিলে ডায়াবেটিস সন্দেহ করা উচিত। আবার ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে চোখের মণিতে (কর্নিয়া) কোনও ঘা হলে তা সেরে উঠতে যথেষ্ট বেশি সময় নেয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে চোখের রেটিনার শিরা বন্ধ হয়ে (রেটিনাল ভেনাস অক্লুশন) দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

গর্ভবতী মহিলাদের ডায়াবেটিস থাকলে চোখের রেটিনার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেজন্য নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করা দরকার।

তাই ডায়াবেটিস দেখা দিলে নিয়মিত ভাবে অন্তত বছরে এক বার চোখ পরীক্ষা করাটা দরকার যাতে কোনও অসুবিধা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তার চিকিৎসা শুরু করা যায়। দেরি হলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমে যায়। যাতে প্রথমেই ধরা পড়ে তাই বছরে এক বার ব্লাড সুগার পরীক্ষা করুন— ৩০ বছর বয়স হয়ে গেলেই।

লেখক পরিচিতি : ডা. চন্দন বারি, এম বি বি এস, ডি ও এম এস। একটা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে চক্ষুরোগবিভাগের চিকিৎসক।

শল্যচিকিৎসার প্রস্তুতি

ডাক্তার অপারেশন করাতে বলছেন? অপারেশন কি আপনার ক্ষেত্রে সত্যিই জরুরি? অপারেশনের আগে কী কী পরীক্ষা করানোর দরকার? কোথায় করাবেন? কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন নিজের ও পরিবারের—
বলছেন **ডা. নীহার রঞ্জন মণ্ডল।**

অপারেশন করার দরকার নেই, অথচ অপারেশন করা হচ্ছে—এমন ঘটনা আকছারই ঘটে। পেট-ব্যথা নিয়ে গেলেন, বাদ পড়ে গেল সুস্থ অ্যাপেন্ডিক্স। স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা রয়েছে, অথচ সিজার করা হল...। প্লাস্টার করে যে অস্থিভঙ্গ সরানো যায়, অপারেশন করে সে হাড় জোড়া লাগানো হল...। সরকারি হাসপাতালে শিক্ষানবিশদের হাত পাকানোর জন্য, আর বেসরকারি ক্ষেত্রে এমনটা ঘটানো হয় মুনাফার জন্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী সুস্থ হয়ে যান, তিনি বা তাঁর আত্মীয়-পরিজন জানতেও পারেন না যে— অপারেশন করার দরকার ছিল না। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এমনটা হয় না, কখনও কখনও অপারেশনের জটিলতা গড়াতে পারে অঙ্গহানি, বিকলঙ্গতা, এমনকী মৃত্যু অবধি।

কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা ছাড়া অন্য উপায় নেই, সেখানে শল্যচিকিৎসার ঝুঁকি নিতেই হয়—হঠাৎ করে হওয়া অ্যাপেন্ডিক্সের তীব্র প্রদাহ (acute appendicitis), পিত্ত-পাথুরি, অন্ত্র ফুটো হয়ে যাওয়া, হার্নিয়া, বাধাপ্রাপ্ত প্রসব, দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, বিশেষ কিছু অস্থিভঙ্গ, চোখের ছানি—এমন সব ক্ষেত্র। শল্য-চিকিৎসাযোগ্য ক্যানসার অপসারণে, হৃদযন্ত্রের কিছু রোগে অপারেশন আয়ু বাড়ায়।

অবেদনবিদ (অজ্ঞান করার ডাক্তার) ও শল্যচিকিৎসকের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে প্রস্তুত করতে হয়—শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ভাবে।

অস্ত্রোপচার দু'ধরনের। 'জরুরি' যা সঙ্গে-সঙ্গে না করলে প্রাণহানি বা অঙ্গহানির ভয়, এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাওয়া যায় খুবই কম। 'পরিকল্পনামাফিক' অপারেশনে সময় পাওয়া যায় অনেকটাই বেশি।

জরুরি ও পরিকল্পনামাফিক দু'ধরনের অপারেশনেই অবশ্যকরণীয় সাধারণ পরীক্ষা হল—রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা মাপা, রক্ত-গ্রুপ নির্ণয়, রক্ত-শর্করা মাপা। বয়স বেশি হলে ইসিজিও করে নেওয়া চাই।

পরিকল্পনামাফিক অপারেশনে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পরীক্ষা করাতে হয়—

- কেবল যাঁদের হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের বুকের এক্স-রে।
- বৃক্কের (কিডনির) সমস্যা থাকলে বা সন্দেহ করলে প্রস্রাবের সাধারণ পরীক্ষা, রক্তের ক্রিয়াটিনিন ও ইউরিয়া এবং সোডিয়াম-পটাশিয়াম।
- মহিলার মাসিক বন্ধ থাকলে গর্ভসঞ্চার নিরূপণ করার জন্য প্রস্রাব পরীক্ষা।
- এইচ আই ভি সংক্রমণের জন্য রক্ত-পরীক্ষা।
- যকৃৎ (লিভার) ও পিত্তথলির সমস্যায় লিভার ফাংশন টেস্ট।
- ছোটদের ক্ষেত্রে রক্ত-ক্ষরণ সময় (ব্লিডিং

টাইম বা বিটি) ও রক্ত-তঞ্চন সময় (ক্লটিং টাইম বা সিটি)। যাঁদের বয়স ১৮ বছরের বেশি, ধরে নেওয়া যায় তাঁদের জীবনে কোনও না কোনও সময়ে রক্তপাত হয়েছে এবং তা বিশেষ মারাত্মক নয়। মারাত্মক রক্তপাতের ইতিহাস থাকলে বড়দেরও বিটি, সিটি পরীক্ষা করানো উচিত।

অপারেশনের আগে সাধারণ কিছু পরামর্শ :

- কোন প্রতিষ্ঠানে অপারেশন করাবেন তা ঠিক করুন নিজের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে।
- যে সব অপারেশন পরিকল্পনামাফিক অর্থাৎ জরুরি নয়, সেগুলোর জন্য ভেবে-চিন্তে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। তবে বেশি দেরি করতে গিয়ে অপূরণীয় শারীরিক ক্ষতি যেন হয়ে না যায়।
- দ্বিতীয় মত নিন। সরকারি হাসপাতালে, সম্ভব হলে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া ভাল, কেন না সেখানে ডাক্তারের পরামর্শ মুনাফার চিন্তায় প্রভাবিত হবে না। পারিবারিক চিকিৎসক কেউ থাকলে তাঁর পরামর্শ নেওয়া উচিত। অপারেশন না করে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যায় কি না জানার জন্য দ্বিতীয় মতামত নেওয়া জরুরি।
- যদি সুবিধা থাকে এবং সামর্থ্যে কুলোয় তা হলে কম কাটা-ছেঁড়া করে অপারেশন করানো বাঞ্ছনীয়, যেমন— পেট কেটে পিত্তথলি বাদ না দিয়ে ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেক্টমি (ল্যাপ কোলে), পেট কেটে প্রস্টেট বাদ না দিয়ে মূত্রপথে প্রস্টেট বাদ দেওয়া। এতে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া যায়।
- সরাসরি ডাক্তার বা হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খরচ-পত্র নিয়ে কথা বলুন। দালালের খপ্পরে পড়বেন না।
- অপারেশনের আগে রক্তে শর্করা মাত্রা, লিপিড (স্নেহপদার্থ)-এর মাত্রা, উচ্চতা-অনুযায়ী আদর্শ ওজন ঠিক রাখা উচিত।
- কোনও রকম নেশা করলে তা অপারেশনের আগে বন্ধ করুন।
- কোনও খাবার বা ওষুধে অ্যালার্জি থাকলে আগে শল্য-চিকিৎসক ও অবেদনবিদকে জানিয়ে রাখুন।
- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ, হাঁপানি, থাইরয়েডের রোগ থাকলে ডাক্তারদের জানান, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কোনও চালু ওষুধ বন্ধ করবেন না।
- আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথি ওষুধ চললে অপারেশনের অন্তত দু'সপ্তাহ আগে বন্ধ করুন।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য :

- অ্যাপেন্ডিসাইটিস—আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে এ রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইতিহাস ও বিশেষ কিছু শারীরিক লক্ষণ থেকে রোগ-নির্ণয় করেন।
- অস্থিভঙ্গ— জটিল ভাবে যদি না ভাঙে বা চামড়ার যদি ক্ষত না থাকে তা হলে অনেক অস্থিভঙ্গের ক্ষেত্রেই অপারেশন না করে চিকিৎসা করার কথা ভেবে দেখা যায়। তবে বিশেষ কিছু অস্থিভঙ্গে অপারেশন না করলে হাড় জোড়া লাগে না।
- পেস-মেকার বসানো— হৃৎস্পন্দন মিনিটে ৬০-এর কম হলেই পেস-মেকার বসাতে হবে এমন নয়। নির্দিষ্টভাবে চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে অজ্ঞান হওয়ার ইতিহাস থাকলে তবেই পেস-মেকার নেওয়া উচিত।
- গর্ভপাত— মাসিক রজোস্রাব বন্ধ থাকা মানেই গর্ভসঞ্চার এমনটা নয়। প্রস্রাবের 'প্রেগনেন্সি টেস্ট' করে দেখে নেওয়া দরকার সত্যি আপনি গর্ভবতী কি না।
- প্রসব— গর্ভাবস্থায় যে পরীক্ষাগুলো করণীয় সেগুলো করে রাখা দরকার।

এই সব বিষয়গুলো যদি রোগী ও রোগীর পরিবার-পরিজনের জানা থাকে, তা হলে অযথা খরচ ও হয়রানি থেকে বাঁচা যায়। নিজেকে শারীরিক ভাবে এবং পরিবার-পরিজনকে আর্থিক ভাবে প্রস্তুত করা যায়। মানসিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে গেলে পরিবারের এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মত-বিনিময় করতে হবে— বিশেষ করে যে অপারেশন করা হবে, তার ভাল দিক ও খারাপ-দিকগুলো নিয়ে আলোচনা। আপনার অপারেশন যিনি করবেন, তাঁর হাতে এই অপারেশন হয়েছে, এমন রোগীর সঙ্গে পরিচয় হলে সুবিধা-অসুবিধা-খরচ জেনে নিন। অস্ত্রোপচারে কী কী ঝুঁকি থাকে সেটাও ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে চাওয়া উচিত। যেখানে অপারেশন করাবেন তার পরিবেশ সম্পর্কে আগে থেকে জানা থাকলে মনে বল পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা করবেন না।

পরিশেষে যে কথা বলার— অযথা ভয় পাবেন না কারণ যেখানে শল্যচিকিৎসা একান্তই দরকার সেখানে তা করতেই হবে। সে সব ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বা বিকল্প চিকিৎসার কোন ওষুধ শল্যচিকিৎসার বিকল্প হতে পারে না। বিজ্ঞানের যত উন্নতি-অগ্রগতি হচ্ছে ততই অপারেশন-পরবর্তী জটিলতা বা মৃত্যু কমছে।

লেখক পরিচিতি : ডা. নীহার রঞ্জন মন্ডল, এমবিবিএস, দীর্ঘদিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রামীণ এলাকায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পে এক সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হয়েছে একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজনে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯০৮৮০৫০৫২৫

জনস্বাস্থ্যের বিকাশ না স্বাস্থ্যের জন্য বড় প্রযুক্তি— রাস্তাটা কোনদিকে?

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে বিশ বাঁও জলে তা বোঝানোর জন্য কোন তথ্য দেওয়ার আর অপেক্ষা রাখে কি? তবে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে ভারতের স্থান যে ১৮৭ টা দেশের মধ্যে ১৩৬, সে কথা একবার বলে দিলে বোধহয় মন্দ হয় না, বিশেষ করে যখন মন্ত্রের মতন ভারতের জিডিপি গ্রোথের ম্যাজিক নম্বরগুলো সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে, আর এই ১৩৬ নং র‍্যাঙ্কিং বা মাল্টি-ডায়মেনশনাল পভার্টি ইন্ডেক্সে স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবেতেই খুব খারাপ স্কোর করার কথাটি, নাঃ ইতি গজও না, একেবারে উহ্যই থেকে যাচ্ছে— লিখছেন ***ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক।***

ছোট করে বলতে গেলে, আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখনও সকলের জন্য নয়, সকলের কাছে লভ্য নয়, সকলের আয়ত্তের মধ্যে নয়। কোন অসুখ বিসুখ হলে নিজের পকেট থেকে যে পরিমাণ ব্যয় হয়, তার পরিমাণ এতই বেশি, যে সে রকম অসুখ-বিসুখ হলে মানুষ দারিদ্রসীমার নিচেও নেমে যেতে পারেন। ভারতে এই ভাবেই দেশের দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যান এক-পঞ্চমাংশ মানুষ।

এ সব কিছুর পিছনে যাকে প্রথমেই দায়ী করা হয়, তা হল, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কম, বিশেষত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় খুবই কম, জিডিপির মাত্র ১.৪ শতাংশ। এই নিয়ে তো দাবিদাওয়া উঠছেই, যদিও তার খুব কমই ফলপ্রসূ হচ্ছে। এই যেমন, সরকারের নিয়োজিত শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের (উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল) প্রস্তাব ছিল, সকলের জন্য স্বাস্থ্য— 'ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার'-এর মন্ত্রটিকে সফল ভাবে রূপায়িত করতে হলে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো মিলে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বর্তমানের জিডিপির ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে অন্তত ২.৫ শতাংশ এবং ২০২২-এর মধ্যে অন্তত ৩ শতাংশ করা উচিত। (জিডিপি মানে হল দেশে এক বছরে যত জিনিস ও পরিষেবা উৎপন্ন হয় তার বাজারমূল্য।) সেই প্রস্তাবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরকার স্বাস্থ্য খাতে খরচ নামমাত্র বাড়িয়ে ১.৬ শতাংশ করেছে। এর সাথে তো আছেই বেসরকারি বিমার ইস্যু ও তাই নিয়ে নানা সমস্যা। এগুলো প্রতিটি একটা আলাদা আলোচনা করার মতো বিষয়।

কিন্তু এখানে আরও একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যা সে ভাবে উঠে আসছে না। সাধারণ মানুষের আউট-অব-পকেট খরচ কমাতে, সকলের আয়ত্তের, নাগালের মধ্যে, সকলের জন্য চিকিৎসার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতে সরকারের খরচ বাড়ানো উচিত, অবশ্যই। কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে খরচের পরিমাণ বাড়াতে হলে কতটা বাড়ানো উচিত? আর সরকারি হোক বা না হোক, স্বাস্থ্যে বেশি খরচ মানেই কি উন্নততর স্বাস্থ্যব্যবস্থা, উন্নততর স্বাস্থ্যসূচক? একটা ন্যূনতম খরচের প্রয়োজন তো আছেই, আরও ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরিকাঠামো, ওষুধ, অন্যান্য পরিষেবা এ সবের জন্য খরচ বাড়ানো প্রয়োজন এবং তার সিংহভাগ সরকারের দিক থেকে, এটা তর্কাতীত। রেড্ডি কমিশনের হিসেব অনুযায়ী ওই স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় ২.৫ শতাংশ করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচ জিডিপির শতাংশ হিসেবে বাড়া মানেই কি ভাল? বা, উলটো প্রশ্নটা করা যাক। কম খরচ মানেই কি খারাপ? যত বেশি, তত ভাল, বা যত কম, তত খারাপ, এরকম কোন সরলরৈখিক সমীকরণ ধরে শেষ কথা বলা যাবে কি এখানে?

বোধহয় না।

ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ জটিল এবং আরও নানাবিধ ফ্যাক্টরকন্টক-পরিপূর্ণ।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের হিসেবে ভারতের স্থান পৃথিবীর সব দেশগুলোর মধ্যে একেবারে শেষের দিকে, ১৭০-এরও নিচে। সেই হিসেবে দেখতে গেলে জিডিপির শতাংশ হিসেবে স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ে ভারত খুব পিছিয়ে নেই, জিডিপির ৬.১ শতাংশ খরচ করে স্থান একাশি নম্বরে। এ বারে এই লিস্টের ওপরের আর নিচের দিকের কিছু দেশের দিকে তাকানো যাক।

এই লিস্টে সবার উপরে আমেরিকা, জিডিপির ১৫ শতাংশ (নতুন হিসেব অনুযায়ী ১৭ শতাংশ) খরচ করে। আমাদের প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা রয়েছে শেষের দিকে ১৬২ তে, জিডিপির মাত্র ৩.৭ শতাংশ খরচ করে। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে, মোট খরচের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও শ্রীলঙ্কা অনেক পিছনে। পার ক্যাপিটা খরচেও এই দেশ একেবারে পিছনের সারিতে।

হঠাৎ এই দু'টো দেশই কেন? কারণটা জানতে গেলে দেশ দু'টোর স্বাস্থ্যের সূচকের দিকে একটু তাকাতে হবে যে। এত কম খরচ করেও শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্য সূচক অন্যদের থেকে কম তো নয়ই, বরং কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকার থেকেও ভাল।

স্বাস্থ্য খাতে মোট খরচ অনেক কম অথচ ভাল সূচক, এই তালিকাতে চলে আসবে কিউবা, কোস্টারিকার মতন দেশও। ম্যাজিকটা কী? ওদিকে উন্নত দেশগুলির মধ্যে তুলনায় আমেরিকা সবচেয়ে বেশি খরচ করে নানা সূচকের দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে। রহস্যটা কী? ম্যাজিকমন্ত্র বা রহস্যের চাবিকাঠি, ওরকম এক কথায় তো বলা যাবে না, বলা উচিতও নয়, এত জটিল ব্যাপার এবং এত রকম ফ্যাক্টর কাজ করছে, দুই দিকেই। কিন্তু এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বেশি খরচ মানেই বেশি ভাল এমনটা নয়, অন্তত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে।

আর কিছু বেসিক কারণ তো খুঁজে বের করাই

যায়। আর যাই হোক, ব্যাপারটা তো আর সত্যিই ম্যাজিক নয়। এই কম খরচে ভাল স্বাস্থ্যব্যবস্থার দেশগুলোর ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখলেও একটা কমন জিনিস বেরিয়ে পড়বে। এই দেশগুলো টার্শিয়ারি ব্যয়সাপেক্ষ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় (মানে বড় বড় হাসপাতাল ইত্যাদি) প্রায় জোর দেয়ই না (যেমন শ্রীলঙ্কা), বা দিলেও কম দেয়। জোর দেয়, খরচ করে, মানে যা খরচ করে তার বেশির ভাগই খরচ করে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জনস্বাস্থ্য খাতে। উলটো দিকে বরং এটা বলা যায়, এই খাতগুলোতে তুলনায় বেশি খরচ (এবং অবশ্যই বেশি করে সরকারি খরচ) করার ফলে মোট খরচ অনেক কম করতে হচ্ছে। আবার এই খাতে বেশি খরচও কিন্তু চরম স্কেলে অনেক কম। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্যখাতে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের (বর্তমানে মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির) মোনিকা দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, শ্রীলঙ্কা তার জিডিপির মাত্র ০.২ শতাংশ ব্যয় করে এই জনস্বাস্থ্যের পেছনে এবং তাই দিয়েই একটি অত্যন্ত ভাল জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছে। অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যে বিনিয়োগ ও মনোযোগ একটি 'কস্ট এফেক্টিভ' বন্দোবস্ত হতে পারে। তবে সবার আগে এই 'জনস্বাস্থ্য' অর্থাৎ Public Health এর সংজ্ঞা নিয়ে দু'চার কথা বলা আবশ্যিক। জনস্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচলিত সংজ্ঞা, জনগণের স্বাস্থ্য, জনগণের জন্য স্বাস্থ্য। কিন্তু Public Health এর আদি এবং কিছুটা পরিমার্জিত সংজ্ঞা ছিল এইরকম, আর এটাকেই আমরা এখানে ব্যবহার করব। Public Health বা 'জনস্বাস্থ্য' হল রাষ্ট্র ও অন্য উৎস থেকে সংগঠিত উদ্যোগ যা সমগ্র জনসাধারণের রোগ ঠেকানো, স্বাস্থ্য ভাল করা, আয়ুষ্কাল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

অর্থাৎ মূলত জনস্বাস্থ্য বলতে রোগ নিবারণের কথা বলা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যের মেডিকালাইজেশনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া আমাদের কাছে এটা কিছুটা অস্বস্তিকরই ঠেকলেও এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সংজ্ঞা সত্যি সত্যিই জনস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা। কারণ, প্রকৃত অর্থে স্বাস্থ্য মানে শুধু রোগ সারানো নয়, রোগ না হওয়াও। অসুখের চিকিৎসা নয়, অসুখ হতেই না দেওয়াও। এবং অসুখ হলে অসুখের শারীরবৃত্তীয় জৈবিক কারণের ওপরেই ফোকাস না রেখে তার পেছনের অন্য লুকোনো কারণগুলোরও সন্ধান করা। শুধু জিনকেই দায়ী না করে ব্যবহারগত, পরিবেশগত রিস্ক ফ্যাক্টরেরও অনুসন্ধান করা। যেমন, ক্যানসার কী ডায়াবেটিস হলে ধূমপান কি মাত্রাতিরিক্ত ওজন। ভাবছেন, এতো আমাদের জানাই। কিন্তু না, যেটা সেভাবে জানা নয়, এই ব্যবহারগত কারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করলে চলবে না, ব্যক্তির সেই ব্যবহারের পিছনের কারণগুলোকেও খুঁজে বের করতে হবে, আধুনিক জনস্বাস্থ্য সেই কথাই বলছে। জনস্বাস্থ্যের এই নন-মেডিক্যাল বা সোশিওইকোলজিক্যাল মডেলে খুঁজতে হবে, রোগীর জিনগত বা ব্যক্তিগত আচরণগত কারণের বাইরে, 'সোশ্যাল

ডিটারমিনেন্টস' ফ্যাক্টরসমূহ : যে অবস্থায় একজন জন্মায়, বড় হয়, বাঁচে, কাজ করে, বুড়ো হয়, সেই সব ফ্যাক্টর স্বাস্থ্যের ওপর প্রচুর প্রভাব ফেলে। WHO-র ২০০৯ সালের 'সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ' (স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকসমূহ)-এর সংজ্ঞা সেরকম কিছুই বলছে ...

হ্যাঁ, স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকগুলো এতটাই প্রভাব ফেলে যে, সমাজবিজ্ঞানীরা এখন এও বলে দিতে পারেন, আপনি কত দিন বাঁচবেন? আপনি যদি আমেরিকায় থাকেন, আপনার জিপ কোড বলুন, বলে দিচ্ছি। এতটাই প্রভাব যে, আমেরিকার দুটো জায়গায় দু'টো কম্যুনিটির বাসিন্দাদের মধ্যে গড় আয়ুর তফাত ৩৩ বছরের! ভারতে এরকম স্টাডি করলে তফাত কি বেশি বই কম হবে? এই কম্যুনিটিগুলোর মধ্যে তফাত ভৌগোলিক অবস্থানের, এমনটাও নয়। তফাত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের, রয়েছে বর্ণগত, জাতিগত, শিক্ষা, বাসস্থানের— সেই স্থানের পরিবেশগত বৈষম্য। আর সেই বৈষম্যই নিয়ে চলে আসছে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য! কারণ, এই ফ্যাক্টরগুলো কখনও সরাসরি অসুখ হবার জন্য, কখনো অস্বাস্থ্যকর অভ্যেস তৈরির জন্য দায়ী। কী ভাবে? খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে, একজন যে পরিবেশে বাস করছে সেখানে যদি হয় জীবাণুদের বাসা, হাওয়ায়, মাটিতে, জলে নানাপ্রকার টক্সিন, দূষণ উৎপাদনকারী এলিমেন্ট মিশে থাকে, বা স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর খাবারের জোগান কম থাকে, উল্টোদিকে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও অন্যান্য নানা কুঅভ্যাসের উপাদান হয় সহজলভ্য, স্বাস্থ্য খারাপ হবে না? নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধূলা না করার জন্য, ওজন বাড়ানোর জন্য একজন ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়, কিন্তু এটা দেখা হয় কি, সেটা করার মতো পরিস্থিতি বা সুযোগ তার আছে কি না? না থাকলে দায়ী কে? হ্যাঁ, দায়ী, এই সব 'সোস্যাল ডিটারমিনেন্টস'। দায়ী অশিক্ষা, বেকারি, দারিদ্র্য, এমনকী জাতিগত, লিঙ্গগত, যে কোনও রকম বৈষম্য, লিঙ্গগত হোক কী জাতিগত কী ধর্মগত যা কিছু ক্রমাগত চাপ তথা 'ক্রনিক স্ট্রেস' তৈরি করতে পারে, সে রকম যে কোনও কারণই। সেই 'ক্রনিক স্ট্রেস', যা স্বাস্থ্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, নানা অসুখ-বিসুখের জন্ম দেয়, যেখানে আমরা কেবল 'মেডিক্যাল ফ্যাক্টরে'র অনুসন্ধানই করে যাই। সময় এসেছে অন্য ভাবে ভাবার, অন্য কিছু অনুসন্ধান করার। আর এটা শুধু যারা এই বৈষম্যের শিকার, তাদের স্বাস্থ্যকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, করছে পুরো দেশের স্বাস্থ্যকেই। কবেই কবি বলে গেছেন, যাদের পিছনে ফেলছি, নিচে ফেলছি, তারা সবাইকে পিছনে টানবে, নিচে নামাবে, এটাই স্বাভাবিক!

আর এও দেখা যাচ্ছে, এই জনস্বাস্থ্য সমাজের প্রায় সব কিছুকেই ছুঁয়ে আছে— "Health in all policy" যে উন্নত বিশ্বে নতুন মন্ত্র হয়ে উঠছে, আশ্চর্য কি?

ভারতের ক্ষেত্রে বৈষম্য? আলাদা করে সেরকম স্টাডি সে ভাবে হয়নি বটে কিন্তু যা সারা দেশ জুড়ে নানা জনজাতির স্বাস্থ্যসূচক দেখলেই বোঝা যাবে, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, জাতপাত সবই স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আর্থিক বৈষম্যের থেকেও বেশি অ্যাবসলিউট দারিদ্র্যের, যেটা এতটাই বেশি, যে বেশির ভাগ মানুষের স্বাস্থ্যে তা বিশাল প্রভাব ফেলছে। আর পরিবেশগত, দূষণগত, অস্বাস্থ্যকর, ক্ষতিকর খাদ্য, পানীয়ের সমস্যার যে সব কথা আগে বলা হল, সে সমস্যা বোধহয় ধনী-দরিদ্র, জাতপাত-ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় সকল ভারতীয়েরই। কারণ, দেশের কোনও অংশেই আদর্শ বা তার কাছাকাছি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেভাবে গড়েই ওঠেনি।

এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া ভাল, এখানে মেডিক্যাল সার্ভিসের গুরুত্বকে কোনও ভাবেই অস্বীকার করা হচ্ছে না, আগেই বলা হয়েছে,

সেখানে নানা খাতে আরো ব্যয় এবং সে বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ একান্ত জরুরি। প্রশ্ন, স্বাস্থ্যের 'মেডিক্যালাইজেশন মোড' নিয়ে।

স্বাস্থ্যের যে 'মেডিক্যালাইজেশন মোড'-এ বর্তমানে আমরা আছি তাতে কি স্বাস্থ্যের খরচ উত্তরোত্তর বাড়ছে না? 'মেডিক্যাল ইন্টারভেনশন', সেখান থেকে সেকেন্ডারি, টার্শিয়ারি আরও আরও উন্নততর 'মেডিক্যাল ইন্টারভেনশন', খরচ বহুল থেকে বহুলতর। তাই ভেবে দেখার সময় এসেছে। আর খরচের কথা বাদ দিলেও তো এই নিয়ে অন্য ভাবে ভাবার সময় এসেছে।

এক সমাজবিজ্ঞানী এই গল্পটা বলেছিলেন। একটা নদীর তীরে দু'টো জায়গা। একটা উজানের দিকে, একের পর এক শিশুকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যটাওয় লোকজন সেই বাচ্চাদের জল থেকে উদ্ধার করছে। সেটা না করে যদি উজিয়ে ওই জায়গাতে গিয়ে শিশু ভাসানোটাই আটকানো যেত, বেশি কার্যকর হত না কি? আপস্ট্রিম ইন্টারভেনশন, রোগের আগেই প্রিভেনশান (অন্তত যেখানে সম্ভব), সেটাই কি বেশি কার্যকর নয়?

সময়ে এক ফোঁড়, অসময়ে দশ ফোঁড়!

জানা কথা। কিন্তু এই ভাবনাটা প্র্যাকটিস করা ও প্র্যাকটিসে এই ভাবনাটা কাজে লাগানোর সময় আসেনি কি?

লেখক পরিচিতি : ঈপ্সিতা পালভৌমিক জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত।

কুইজ

এ বারের ক্যুইজটি তৈরি করেছেন অভিষেক দাস, পুনেতে মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পাঠরত ছাত্র। অসুখ-বিসুখ নিয়ে সাধারণ ভাবে অনেক প্রচলিত ধারণা আছে যার কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। এই ধারণাগুলোর কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল, তাই নিয়েই এ বারের ক্যুইজ। উত্তরদাতা কোন ধারণাটি ভুল অথবা ঠিক মিলিয়ে দেখে নিন।

১। চিকেন পক্স বা জলবসন্ত-র গুটির খোসা থেকে রোগ ছড়ায়।

২। হাম ও পক্স একই অসুখ।

৩। হাম বা পক্স হলে মাছ-মাংস ইত্যাদি আমিষ খেতে নেই।

৪। গর্ভবতী মহিলাদের ধূমপান ও মদ্যপানে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হয়।

৫। অসুখ করলে আপেল-আঙুর ইত্যাদি ফল খাওয়া দরকার।

৬। রক্তে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন ইত্যাদি ক্ষতিকারক স্নেহজাতীয় পদার্থের মাত্রা বেশি হলে ঘি, মাখন, ডিম, পাঁঠার মাংস ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়।

৭। মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময় অন্য কোনও ওষুধ খাওয়া বারণ।

৮। HIV-AIDS রোগীর সঙ্গে কথা বললে, ছোঁওয়া লাগলে রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৯। কম বয়স থেকে ওজন খুব বেশি হলে ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

১০। বায়োপ্সি করলে ক্যানসার বেশি ছড়িয়ে যায়।

১১। কনজাংটিভাইটিস বা চোখ ওঠা রোগীর চোখের দিকে তাকালেই রোগটা হতে পারে, তাই রোগীর কালো চশমা পরা উচিত।

১২। শিশুদের হাঁপানিতে ইনহেলার ব্যবহার করা উচিৎ নয়— তা হলে ছোটবেলা থেকেই এটার অভ্যাস হয়ে যায়।

১৩। কুষ্ঠ বংশগত রোগ।

১৪। ব্লাডপ্রেশার বেশি থাকলে নুন কম খাওয়া উচিত।

১৫। ঠিকমতো পায়খানা না হলে ব্রণ হয়।

উত্তর ২৮ নং পাতায়

চিঠিপত্র

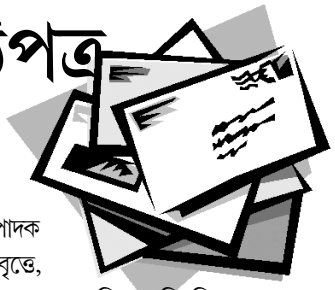

প্রিয় সম্পাদক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে,

আমি আপনাদের পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। শুধু গ্রাহক বললে সত্যের বড়মাপের অপলাপ করা হয়, আদতে এই পত্রিকাটির আমি রীতিমত গুণগ্রাহী। চমৎকার এর সম্পাদনা চমৎকার এর বিষয় বৈশিষ্ট্য, আর সবচেয়ে যেটা নজর কাড়ে, তা হল এখানে যাঁরা লিখছেন বা যাঁরা এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আছেন, তাঁদের সৎ প্রচেষ্টার একটি স্পষ্ট অবয়ব এই পত্রিকার প্রতি পাতায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বোঝা যায়, কত যত্নে কিছু হাত, হৃদয় আর মস্তিষ্ক সামলাচ্ছে এই উদ্যোগটিকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে মনে যে তবে কি এই পত্রের অবতারণা নিছক প্রশংসা বর্ণনের উদ্দেশ্য? না, আসলে কিছু বলবারও আছে আমার এবং তা আছে রীতিমতো বাঙালি ঐতিহ্য মান্য করেই। সেই ঐতিহ্য হল শুধু জড়িয়ে থাকবার অধিকারেই বাঙালির মনে একগুচ্ছ সমালোচনা এবং পরামর্শের জন্ম হয় যা না উগরোনো অবধি বাঙালির শান্তি নেই। কিছু মতামত সেই জন্মসিদ্ধ অধিকারে ভাসিয়ে দিলাম।

প্রথমেই বলতে হয় এই পত্রিকাটির প্রচারের কথা। এত ভালো একটি পত্রিকার যে আরও প্রচারের প্রয়োজন, তা সত্যিই বলবার অপেক্ষা রাখে না। আমার মনে হয়, এদিকটায় নজর দেওয়া সঠিক জরুরী। আমার কথাই ধরা যাক। যে আমি এই পত্রিকাটি নিয়ে আজ রীতিমতো চিঠি লিখতে বসে গেছি, কয়েকমাস আগে সেই আমিই এত সুন্দর পত্রিকাটির বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীমতি রুমঝুম ভট্টাচার্য, যে এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকে আপন যোগ্যতাবলে, প্রথম এই পত্রিকা আমায় পড়তে দেয়। এখন আমার একটি এমন বন্ধু আছে বলেই যে অন্য মানুষদের সেই সুবিধাটি আছে তা তো নয়। আর বিভিন্ন বুকস্টলে রেখেই শুধুমাত্র প্রচারের কাজটি সুসম্পন্ন হলো এক্ষেত্রে তা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। এত শুভ একটি উদ্যোগ, এত মহৎ একটি প্রচেষ্টা যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাও একটা বড় কাজ। দরকারে দরজায় দরজায় প্রচারের প্রয়োজন আছে এর। অন্য কোনও কারণ নয়, সমাজের মঙ্গলের জন্যই এই পদক্ষেপ জরুরী বলে মনে হয়। সমস্ত মহৎ কাজ এভাবেই সার্থক হয়ে এসেছে চিরকাল।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন অনুভব করি। এই পত্রিকায় চিকিৎসা বিষয়ক যে লেখাগুলি প্রকাশ করা হয়, সেগুলোর গুণমান যে সুউচ্চ— সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ভাষা যেন বড় বেশি তথ্য নির্ভর আর নীরস। সেখানে পাঠক যেন একাত্ম হতে গিয়েও অনেক সময় হতে পারে না। ভাষা বা লেখার ধরন আরেকটু ঘরোয়া হলে, আজকের ভাষায় থাকে বলে লেখাগুলি আরও user friendly হয়ে উঠবে। একটা উদাহরণ দিই। কোনও একটি বিষয় নিয়ে তথ্যচিত্রও তৈরী করা যায়, আবার মনোজ্ঞ রুচিশীল সিনেমাও তৈরী করা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্শককে কাছে টানবার সম্ভাবনা কিন্তু সব সময়েই বেশি। এক্ষেত্রে, প্রশ্নোত্তরের ধরণ বা গল্প বলবার ধরণ অবলম্বন করবার বিষয়টি নিয়ে ভাবা যেতে পারে। একই সঙ্গে পাঠকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার একটি বিভাগ চালু করা যেতেই পারে।

তৃতীয়ত আজকাল যে কোনও গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে একটু বিনোদনের সংস্রব থাকা যেন যুগের নিয়ম হয়ে উঠেছে। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা এখন বইমেলায় দেখতে পাই বই-এর স্টলগুলির পাশে বিরিয়ানির স্টলের যথেচ্ছ সহাবস্থান। আমি সে বাড়াবাড়িতে যেতে বলি না। কিন্তু ভাবি, যদি একটি সাহিত্যধর্মী ধারাবাহিক জাতীয় কিছু রাখা যায় প্রতি সংখ্যায়, তাহলে কিছু সংখ্যক পাঠক কিন্তু ধারাবাহিকটির আকর্ষণেই হয়তো পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যা কিনতে থাকবে, যার ফলে আদতে এই পত্রিকাটি আরও কিছু পরিবারের অন্দরমহলে গিয়ে সেঁধোবে এবং হয়তো কিছু আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টি আসল বিষয়গুলির প্রতিও আকর্ষিত হবে।

পরিশেষে আবার বলি, পত্রিকাটি আমার সবিশেষ কাছের বলেই এতগুলো বক্তব্যের অবতারণা। পত্রিকাটির চরিত্র অনুভব করে মনের কোণে যেমন একটা যেন ভরসা আছে। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীন কুশল ও বৃদ্ধি কামনা করি।

সৌমিত্র চক্রবর্তী, হাওড়া।

বিষয় হোমিওপ্যাথি

সম্পাদক সমীপেষু,

টেলিফোনে কথা বলে আমি জানতে পারি যে আমার বই যাতে হোমিওপ্যাথির সমর্থনে বক্তব্য আছে তার বিজ্ঞাপন আপনাদের পত্রিকায় ছাপা হবে না। আমি গত ১০ই মার্চ তারিখে একটা ই-মেল করে কারণটা জানতে চেয়েছিলাম। দীর্ঘ তিন মাস পরেও তার কোনও জবাব পেলাম না। ২৪ এপ্রিল তারিখের পরের ই-মেল-এ জানতে চেয়েছিলাম আমার বই যদি পাঠাই তবে কি তার রিভিউ ছাপাবেন? তার জবাব কিন্তু এক দিনের ভেতরেই পেয়ে গিয়েছি। পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে, হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আপনাদের যে স্ট্যান্ড তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আপনাদের মতো ডাক্তাররা এই যে mass allergy-তে ভুগছেন এর দাওয়াই যে কি আমার জানা নেই। এতো চেষ্টা করেও একটা ডায়ালগ শুরু করা গেল না। একজন বিজ্ঞানী, যতদূর মনে পড়ে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পুরানো মতবাদ, ধ্যান ধারণাকে হটিয়ে দিয়ে নতুন কোনো মতবাদ দীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে না। নিত্য নতুন জেনারেশন নতুন নতুন মতবাদ, তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আসে। পুরনো মতবাদ, তত্ত্ব তার প্রবক্তাদের জীবনবসানের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সত্যিই কি তাই? বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যুক্তি, তর্ক, ডায়লগ, ডায়ালেকটিক্স-এর কি কোনো ভূমিকা নেই? যদি সত্যিই তাই হয় তবে হোমিওপ্যাথি কেন কবিরাজী, হাকিমি, টোটকা, তুকতাক মেনে নিতে অসুবিধাটা কোথায়। আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুরা কী বলেন তার প্রতীক্ষায় রইলাম।

আশা করি আমার চিঠি ছাপানোর মতো সৌজন্যটুকু আপনারা দেখাবেন।

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

হোমিওপ্যাথি বা অন্যান্য বিকল্প চিকিৎসা- ব্যবস্থা নিয়ে স্বাস্থ্যের বৃত্তে লেখা ছাপানো হবে না, সম্পাদকমণ্ডলী এমন কোনও সিদ্ধান্তে আসেননি। যে কোনও লেখা ছাপাতে গেলে তাতে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রতিফলিত হবে, এইটুকুই কাম্য। বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা যে সব লেখা এ পর্যন্ত পেয়েছি, তার মধ্যে যুক্তির সামগ্রিক সুপ্রয়োগ এখনও বিশেষ দেখিনি। একটা লেখায় সেই প্রয়োগ দেখেছি, এই সংখ্যায় সেই লেখাটির ('বিকল্প চিকিৎসা না চিকিৎসার বিকল্প', রাজা ভট্টচার্য) প্রথম পর্ব ছাপানো হল।

সম্পাদকমণ্ডলী, স্বাস্থ্যের বৃত্তে

বিকল্প চিকিৎসা না চিকিৎসার বিকল্প? (পর্ব ১)

চিকিৎসা ব্যাপারটা কেবল মানবিকতা নয়, সেটা বিজ্ঞানও বটে; আর বর্তমান সময়ে চিকিৎসা হল অনেকের ব্যবসা, আর অনেকের ক্ষমতার উৎসও। এই অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার নিরপেক্ষ তুলনা পাওয়া শক্ত— আপনাকেই বেছে নিতে হবে কোনটা কাজের আর কোনটা অকেজো—লিখছেন **রাজা ভট্টাচার্য**

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, ''রমেশবাবু, আপনার কি অসুখ করিয়াছে?''

রমেশ কহিল, ''বিশেষ কিছু নয়।''

অন্নদাবাবু কহিলেন, 'আরে কিছুই নয়, হজমের গোল হইয়াছে— পিত্তাধিক্য। আমি যে পিল ব্যবহার করে থাকি তাহার একটি খাইয়া দেখ দেখি—''

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, ''বাবা, ঐ পিল খাওয়াই নাই, তোমার এমন আলাপী কেহ দেখি না— কিন্তু তাহাদের এমন কি উপকার হইয়াছে?''

অন্নদা কহিলেন, ''অনিষ্ট তো হয় নাই।''

(নৌকাডুবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিভিন্ন চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার প্রথমেই রবিঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়তো বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতির সমর্থকদের উৎসাহ যোগাবে, কেননা কে না জানে, রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন হোমিওপ্যাথি আর আয়ুর্বেদ নিয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন, নিজে হোমিওপ্যাথি ও পরে বায়োকেমিক মতে চিকিৎসা করেছেন, এবং পারতপক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা, যা এদেশে অ্যালোপ্যাথি নামে বেশি পরিচিত, তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। [১] আমরা কিন্তু দেখাতে চাইব, কোনও এক বিশেষ ধরন চিকিৎসা বেছে নেওয়ার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিই যে সবসময়ে কাজ করে তা নয়; নানা অজানা আশঙ্কা থেকে অযৌক্তিক ব্যক্তিনির্ভরতা, এমনকি বিভিন্ন স্বার্থসন্ধান, সবই নানা চিকিৎসাপদ্ধতির সাপেক্ষে আমাদের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত করে। এবং রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল চেতনায় ও সৃষ্টিতে আমাদের এই অবস্থান প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রবন্ধশেষে এ-প্রসঙ্গে পুনরায় আসা যাবে।

বর্তমানে অন্নদাবাবু কথিত এই 'পিল'-এর ইংরাজি নামটি হল 'ক্যাম' (CAM) বা Complementary and Alternative Medicine, বাংলায় বলা যেতে পারে. 'পরিপূরক এবং বিকল্প ওষুধ'। অন্নদাবাবুর মতো অনেকেরই ধারণা যে, বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ওষুধ, যাকে 'অ্যালোপ্যাথি' বলা হয় (নামটি ভুল, কিন্তু সে প্রসঙ্গে এখন যাচ্ছি না), তাদের সবকটার কোনও না কোনও 'সাইড এফেক্ট' বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। অথচ ক্যাম-এর নাকি কোনও ক্ষতিকারক দিক বা 'সাইড এফেক্ট' নেই।

◆ কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

'অ্যালোপাথি' ওষুধের 'সাইড এফেক্ট' আছে, একথা ঠিক। মাথা ধরলে অ্যাসপিরিন খেলে পেটে ব্যথা হতে পারে, তাই ভরা পেটে খাওয়াই ভাল, নয়তো খামোকা অ্যান্টাসিড গিলতে হবে। অ্যাসপিরিন পাকস্থলিতে গিয়ে সেখানকার অ্যাসিড ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, সেটা তার 'সাইড এফেক্ট'। তবে সামান্য মাথাব্যথায় অ্যাসপিরিনের প্রয়োজন নেই, একটু ঘুমও ভাল কাজ দেয়। কিন্তু আধুনিক জীবন বড়ই জটিল। সব সময় ঘুমের সুযোগ থাকে না। যেমন ধরুন ইন্টারভিউ আছে আর মাথা ধরেছে। এটা কী ঘুমের সময়? অতএব অ্যাসপিরিনের জয়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমার কথা মনে পড়ে? ''The plain human courage...''— অ্যাসপিরিন না খেলে সিদ্ধার্থের ঐ উত্তর বেরতো? তবে হ্যাঁ, ইন্টারভিউ না থাকলে অ্যাসপিরিন না খেয়ে 'বিকল্প ওষুধ' না খাওয়ার কোনও কারণ নেই। সামান্য মাথাব্যথায় বিকল্প ওষুধ 'কাজ' দেয়। তবে 'কাজ দেওয়া' কথাটা বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি ভেদে ভিন্ন অর্থে না নিয়ে উপায় নেই। হোমিওপ্যাথি হলে তা অনেকটা প্ল্যাসিবো বা 'রোগীতোষ' হিসেবে কাজ করে। প্ল্যাসিবো কথাটার ব্যাখ্যায় যথা সময়ে আসব। কিন্তু যদি বলি আয়ুর্বেদিক ওষুধ, বা নিদেনপক্ষে ভেষজ ওষুধ, দিয়ে মাথাধরার চিকিৎসা করা ভাল, তবে অ্যাসপিরিন কী দোষ করল? অ্যাসপিরিনের বেদনানাশক পদার্থটির নাম অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড (ASA)। নামটা রাসায়নিক হলেও পদার্থটি প্রথম পাওয়া যায় উইলো গাছের বাকল থেকে। প্রাচীন মিশরে জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য উইলো গাছের চা খাওয়া হত। ১৮৯৯ সালে প্রথম উইলো গাছের বাকল থেকে ASA নিষ্কাশন করে জ্বরের ওষুধ হিসেবে বিক্রি করা শুরু হয়। উইলো গাছের বাকল থেকে তৈরি করা হতো চা, টিংচার, ক্যাপসুল ইত্যাদি। এটাও জানা ছিল যে ওই চা বা টিংচার খেলে পেট ব্যথা এবং মাঝে মধ্যে বমিভাবও হয়। বলা হতো ওষুধের সঙ্গে খাবার খেলে ওই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম হবে। মিলে যাচ্ছে অ্যাসপিরিনের সাথে? আর এ তো ১৮০০ সালের কথা। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র তখনও শৈশবই দেখেনি। বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ লুদউইগ ফন বেথোফেন-এর মৃত্যুর কারণ নাকি তাঁর অতিরিক্ত উইলো চা খাওয়া। বেথোফেন-এর দেহের ময়না তদন্তে দেখা যায়, অতিমাত্রায় স্যালিসিন উৎপত্তির ফলে তাঁর বৃক্কের ক্ষতি হয়েছে। স্যালিসিন তৈরি হয় ASA-র থেকে। বেথোফেন-এর ময়না তদন্তই পৃথিবীর সর্বপ্রথম নথিভুক্ত প্রমাণ যাতে ভেষজ ওষুধের ক্ষতিকারক দিকের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

সারা বিশ্বের বাজারে নানা প্রকার বিকল্প ওষুধ তৈরি ও আমদানি-রফতানি হয়। এগুলোর মধ্যে ভারতে আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথির শেয়ার সর্বাধিক। অতএব আপাতত এই দু'টো বিকল্প 'চিকিৎসা'-পদ্ধতিতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। আর আলোচনা যেহেতু মূলত 'ওষুধ'-এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে, সেহেতু আয়ুর্বেদের নানা ওষুধ, বিশেষ করে গাছ-গাছড়া থেকে পাওয়া ওষুধ, নিয়ে আলোচনা করব। কেননা, আয়ুর্বেদের অন্য কিছু অংশ, যেমন যোগসাধনা, বা আয়ুর্বেদের তত্ত্বগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব না। যদি বলি আমাদের

দেহের কার্যপ্রণালী তিনটি রস বা 'দোষ'-এর ওপর ভিত্তি করে চলে, আর কোনও একটা দোষের 'ভারসাম্যহীনতা' শরীরে রোগের সৃষ্টি করে, আর নাড়ি টিপে সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব, এবং 'হঠযোগ'-এ সেই ভারসাম্যহীনতা ফিরিয়ে এনে রোগ নিরাময় করা যায়, তো সেটা নিয়ে বাদানুবাদই সার হবে। কারণ এ-বাবদে রোগ, নিরাময়, যোগের সঠিক পদ্ধতি, যোগ্য গুরু, ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর আলোচনা বা তর্কাতর্কি হবে, কিন্তু এই মূল সংজ্ঞাগুলোতে একমতে পৌঁছানো যাবে না। আর মূল সংজ্ঞাগুলোতে একমত না হলে অনেক এলোমেলো কথা হবে, কিন্তু তার অধিকাংশই এত ধোঁয়া-ধোঁয়া যে কোনওভাবেই তা থেকে কাজের কিছু বেরোবে না। শেষে বোধকরি 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' গোছের কথা বলে যোগীরা যোগসাধনায় ফিরে যাবেন। অতএব এখানে আমরা ভেষজ ওষুধের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকব, কারণ তা চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, জিভে স্বাদ নেওয়া যায়, আর অনেক ক্ষেত্রে আঘ্রাণও সম্ভব। এখন প্রশ্ন হল, এগুলোর সত্যিই কি কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই? শুধুই কার্যকারিতা আছে? উইলো গাছের রসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি। এবারে আসি কিছু 'অত্যাধুনিক' ভেষজ ওষুধের আলোচনায়।

◆ অনন্ত যৌবন :

ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. জ্যাক সজট্যাক (Jack Szostak) ২০০৯ সালে নোবেল প্রাইজ পান। ড. সজট্যাক, ক্যারল গ্রেইডার আর এলিজাবেথ ব্ল্যাকবার্ন এই তিনজন 'টেলোমিয়ার' নামক এক জৈব পদার্থের গঠন আবিষ্কার করে নোবেল বিজয়ী হন। টেলোমিয়ার ক্রোমোজোমের প্রান্তে বসে থাকে, অনেকটা ঠিক টুপির মতো, আর ক্রোমোজোমের ভাঙন রোধ করতে সাহায্য করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে টেলোমিয়ারের ক্ষমতা কমতে থাকে এবং ক্রোমোজোমের ভাঙন আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়— কেন দেয় বা কীভাবে দেয় সেটা এক আলাদা উপাখ্যান, হয়তো পরে কোনও সময়ে সে কথায় আসা যাবে। টেলোমিয়ারের ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এক রকম উৎসেচক বা এনজাইম— তার নাম টেলোমারেজ। এই মৌলিক আবিষ্কার জীববিজ্ঞানের এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে, মানুষকে দীর্ঘায়ু করার চাবিকাঠি হয়তো বা হাতের মুঠোয় ধরা দেবে এমন আশা দেখা দেয়। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আগাছার মতো আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠে ছোট-ছোট ব্যবসায়িক ঔষধপ্রতিষ্ঠান। এরা সবাই তৈরি করতে চায় সঞ্জীবনী বড়ি।

এমনই এক প্রতিষ্ঠান, নাম টেলোমারেজ অ্যাকটিভেশন সায়েন্সেস (TAS), দাবি করে যে তারা *Astragalus membranaceus* নামের এক উদ্ভিদ থেকে একটা ভেষজ ওষুধ তৈরি করেছে যা টেলোমিয়ারের ক্ষমতা বাড়াবে এবং বার্ধক্য রোধ করবে। ওই উদ্ভিদটি একেবারে অপরিচিত কোনও গাছ নয়, চিনে হুয়াং কুই (ইংরাজি করলে এর মানে দাঁড়ায় ''yellow leader'' বা হলুদ নেতা) নামে এই গাছটি পরিচিত। TAS ওষুধটি TA-65 নামে বিক্রি করা শুরু করল আমেরিকার ভেষজ ওষুধের দোকানে। TA-65 আমেরিকার সরকারি খাদ্য এবং ওষুধ সংস্থা দ্বারা ওষুধ হিসেবে অনুমোদিত নয়, তাই একে ওষুধ বলে বিক্রি করা ওই দেশে সম্ভব নয়; একে বিক্রি করা হল 'Nutraceuticals' হিসাবে। [২] 'Nutraceuticals' কথাটা 'Nutrition' আর 'Pharmaceuticals' এ-দুটো কথার বকচ্ছপ-মার্কা ধড়েমুড়ো সন্ধি। সংজ্ঞা অনুযায়ী, এটা খাদ্যের পুষ্টিমূল্যবর্ধক বস্তু, যার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ে, বিশেষত অসুখ আটকানো ও সারানোয়, অবদান আছে।

ওদেশে ওষুধ ব'লে সরকারি অনুমোদন নেই, কিন্তু TAS তাদের বাজার বিস্তৃত করতে চায়, চায় বিদেশি ক্রেতা। ব্রায়ান এগান নামে এক আমেরিকানকে মার্কেটিং বিভাগের অধিকর্তা করল TAS। তাঁর হাতে দেওয়া হল বিদেশে TA-65 বিক্রির দায়িত্ব। সংস্থার চুক্তি অনুসারে মিস্টার এগান-কে TA-65 খেতে হবে দিনে দু'বার। এতে ক্রেতার কাছে প্রমাণ করা যাবে যে, এই ওষুধটি আমেরিকার সরকারি সংস্থার অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর ও নিরাপদ, অন্তত নিরাপত্তা নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই, নইলে মার্কেটিং বিভাগের অধিকর্তা স্বয়ং রোজ দু'টো করে খান? সরকারি সংস্থার প্রতি সন্দেহ বোধকরি মজ্জাগত, আমেরিকা ইংল্যান্ডের নাগরিকও তাঁদের নিজস্ব সরকারি স্বাস্থ্য-সংস্থার প্রতি তেমন আস্থা পোষণ করেন না। ভারতের মতো দেশে অবশ্য এমন অবিশ্বাস আরও বেশি। ভারতে TAS-এর মতো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সুবিধা বেশি, কেননা ভারত সরকার স্বয়ং 'আয়ুশ' (AYUSH) [৩] তৈরি করে বিকল্প চিকিৎসার ব্যবস্থা শুধু নয়, বিকল্প ওষুধের কারবার করছে। এই দেশে 'নিউট্রাসিউটিক্যালস' বলে TA-65 বিক্রি করা এমন কি কঠিন কাজ? কিন্তু এগান সাহেবকে কী করে কব্জা করল TAS? সরকার অনুমোদন না দিলেও TAS সংস্থার নিজস্ব বিজ্ঞানী ডা. কেলভিন হার্লে পরীক্ষা করে দেখান যে সম্পূর্ণ শক্তিশালী হোক বা না হোক, TA-65 একটি অক্ষতিকর ওষুধ যা যৌবন ধরে রাখতে সাহায্য করবে। একে চাকরির প্রয়োজন, আর মার্কেটিং বিভাগে লোভনীয় মাইনে, অন্য দিকে ডা. হার্লের

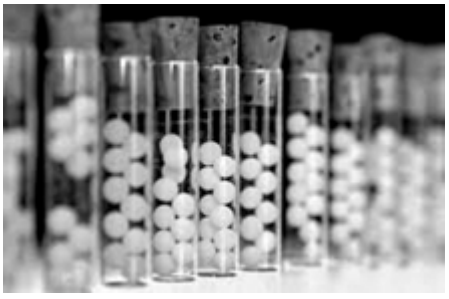

বিধান, এই সব মিলেই মি. এগান চুক্তিপত্রে সই মেরে দিয়েছিলেন। চার মাস টানা দিনে দু'বার TA-65 খাবার পর হঠাৎই ধরা পড়ল এগান সাহেবের প্রস্টেটে ক্যানসার! এগান-এর দাবি, ওই ভেষজ বড়ি খেয়েই হয়েছে ওই ক্যানসার। TA-65 খাচ্ছিলেন এমন আরও এক ভদ্রলোক দাবি করেন তিনি ওটা খেয়েই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। TAS সংস্থা অবশ্য সেই দাবি উড়িয়ে দেয়। কিন্তু দুজনে ২০১২ সালে নিউ ইয়র্কের সুপ্রিম কোর্টে এক জবরদস্ত 'ক্লাস অ্যাকশন' মামলা ঠুকলেন। মামলার রায় কার পক্ষে যাবে বলা কঠিন, তবু এটুকু জানানো দরকার যে এর জেরে এই কোম্পানির ওষুধ বিক্রির অভূতপূর্ব ক্ষতি হয়েছে।

আরও জানানো প্রয়োজন, যে সবেধন নীলমণি বৈজ্ঞানিক পত্রের ওপর ভিত্তি করে এই TA-65 এর রমরমা, সেই ২০১১ সালে স্পেন থেকে প্রকাশিত পত্রে ক্যানসারের ইঙ্গিত ছিল। পরীক্ষাগারে গবেষণার কাজে ব্যবহৃত ইঁদুরদের TA-65 খাওয়ানোর পর তারা লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। পরীক্ষার ফলাফল পরিসংখ্যানশাস্ত্রের বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ না হওয়ায় এমন গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি। লাভ করার মোক্ষম সুযোগ TAS হাতছাড়া হতে দেয়নি; ড্রাগ ট্রায়ালের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে ওষুধ সম্পর্কিত আইনের নাগালের বাইরে নিউট্রাসিউটিক্যাল নামে TA-65 বিক্রি করা শুরু করে। ২০০৯-এ নোবেলজয়ী তিন বিজ্ঞানীর

একজন ড. গ্রেইডার স্পষ্ট বলেছেন— এটি ড্রাগ হিসেবে পরীক্ষা বা ট্রায়াল না করে নিউট্রাসিউটিক্যাল বলে বিক্রির অনুমোদন দেওয়া মোটেই ঠিক হয়নি। ক্লাস অ্যাকশন মামলা, বিজ্ঞানীদের সাবধানতা, এমনকী আইনের মারপ্যাঁচও TA-65 বিক্রি বন্ধ করতে পারেনি। আমেরিকা ইউরোপের খোলাবাজারে, বিশেষ করে ইন্টারনেটের বিশ্ববাজারে, এ-দ্রব্যের ঢালাও বিক্রি চলছে। একটাই তৃপ্তি, এই বিশ্বব্যাপী খারাপ প্রচারের ফলে কোম্পানির নাকি ২০ লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে। তবে জোরালো আইনের গেরোয় পড়ে ওই সব ওষুধ কোম্পানি আমেরিকা-ইউরোপ ছেড়ে ভারতের মতো 'বন্ধুত্বপূর্ণ' দেশে ওষুধ-ট্রায়াল করতে আসবে, এমন সম্ভাবনা বেশি। আর যে দেশে ভোপালে লক্ষ মানুষ মেরেও সাজা হয় না, সেখানে এই সব ড্রাগ-ট্রায়ালের রোগীরা ক্ষতি হলেও মুখ বুজে কিল হজম করতে বাধ্য থাকবেন।

এরকম আর একটি হার্বাল ওষুধ নিয়ে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে কিঞ্চিৎ শোরগোল চলেছে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে অস্ট্রেলিয়ার সরকারি ওষুধ সংস্থা জনসাধারণকে একটি হার্বাল ওষুধের ক্ষতির কথা জানিয়ে সাবধান করে। ওষুধটির নাম ব্ল্যাক সালভে (Black Salve)। ক্যানসারের মলম হিসাবে ওষুধটি বিক্রি হত। এতে আছে ব্লাডরুট বা বিটরুটের থেকে নিষ্কাশিত স্যাঙ্গুইনারিন। এই মলম লাগিয়ে অন্তত চারজনের দেহে সাংঘাতিক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ। ওষুধটিতে জিঙ্ক ক্লোরাইড নামে একটি রাসায়নিক আলাদা করে যোগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সব শেষে বলে রাখি, আয়ুর্বেদিক ওষুধের তালিকায় এই ব্ল্যাক সালভে বা TA-65 পড়ে না। কিন্তু আমাদের মূল যুক্তি, ভেষজ হোক আর প্রাকৃতিক হোক, সব ওষুধেরই পার্শ্বক্রিয়া সম্ভব— সেটা আয়ুর্বেদিক সব ওষুধের জন্যও প্রযোজ্য। পরে এ-কথায় আমরা আবার ফিরব।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি মেনে নেওয়া যায়?

অনেকে হয়তো বলবেন, ''সে না হয় মানলাম হার্বাল ওষুধের ক্ষতিকারক দিক আছে, কিন্তু সে তো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ওষুধেরও আছে। তবে?'' প্রথমেই বলব, হার্বাল ওষুধে 'অনিষ্ট তো হয় নাই' — এই বিশ্বাস দূর হওয়াই অনেক অগ্রগতি। আর বলব আধুনিক ওষুধে ক্ষতিকারক দিক অবশ্যই আছে। কিন্তু বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে তবে এই ওষুধ ক্রেতার কাছে পৌঁছয়, এবং তাতে ওষুধের কী কী ক্ষতিকারক দিক রয়েছে সেটা জানানো হয়। তবে তাতেও ভুল হয়, অনিচ্ছাকৃত এবং অনেক সময় (ওষুধ কোম্পানির চেপে রাখা তথ্যের কারণে) ইচ্ছাকৃত ভুল। কখনও-সখনও রোগীর ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পরে ওষুধ বাজার থেকেই প্রত্যাহার করতে হয়। যে ওষুধ নিয়ে তার ক্ষতির দিকটা ধরে ফেলার উপযুক্ত পরীক্ষা করার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, তার ওপর নির্ভর করা সম্ভব; তবে ওষুধ কোম্পানি যদি সরকারের সঙ্গে আঁতাঁত করে দেশবাসীকে ঠকায় সে ঠেকানো সহজ নয়। কিন্তু সেটা দেশের নীতির দোষ, বিজ্ঞানের নয়। আর যে সব ওষুধের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবেই ভরসা রাখতে হবে ''আমাদের ওষুধে ওই সব সাইড এফেক্ট-টেফেক্ট নাই বাপু'' মার্কা আপ্তবাক্যের ওপর, সেটাকে বিশ্বাস করা মৌলিক ভাবেই অনেক কঠিন। ওষুধ কোম্পানি দেখে তাদের মুনাফা, সে ভেষজ ওষুধই হোক কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ, তাদের লক্ষ্য কারবারে লাভ করা। কিন্তু জনসাধারণের লক্ষ্য হবে, তাঁদের যেন কেউ ক্ষতি করতে না পারে। সেজন্য সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো শক্তিশালী করতে হবে, আর সেই সংস্থাগুলো ঠিক কাজ করছে কি না বা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে কি না সে ব্যাপারে কড়া নজরদারি রাখতে হবে জনসাধারণকেই।

এ ছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে সাইড এফেক্ট-এর মাত্রা কী? মাথাব্যথা কমানোর ওষুধে পেটব্যথা শুরু হলে সেই ওষুধ যত দূর সম্ভব না খাওয়াই ভাল। কিন্তু মাথাব্যথার কারণ যদি কোনও টিউমার হয়? যদি ক্যানসার থেকে ব্যথা হয়? সেটা কমাতে পারে এমন 'বিকল্প ওষুধ' পাওয়া গেলে সব দেশের সরকার তাকে মাথায় তুলে নাচতো। কিন্তু সেটা নেই, অতএব অ্যালোপ্যাথি। এখন ক্যানসারে কেমোথেরাপির প্রয়োজন হলে চুল পড়ার ভয়ে কি চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে? কেশবিন্যাস যদি কোনও ক্যানসার-রোগীর কাছে ক্যানসারের কষ্টের চেয়ে, বা আগতপ্রায় মৃত্যুর চেয়ে বড় ব্যাপার বলে মনে হয় তিনি স্বচ্ছন্দে কেমোথেরাপি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় অনিচ্ছুক রোগীকে কেমোথেরাপি করানোর জন্য ডাক্তার কখনওই বলবেন না যে এই চিকিৎসার কোনও সাইড-এফেক্ট নেই। তিনি বলবেন, হ্যাঁ, এতে চুল পড়বে, শরীরের শক্তি কমে যাবে, কিন্তু রোগীকে দেওয়ার মতো আর কোনও চিকিৎসা আমাদের ভাণ্ডারে নেই বলে এই ওষুধই আমাদের দিতে হচ্ছে। তাঁরা যদি সাইড-এফেক্ট নেই বলেন, তো সেটা রোগীকে ডাহা ঠকানো হবে। একটু ভেবে দেখুন, বিকল্প-ওষুধ কি ঠিক এইটাই করছে না? 'সাইড-এফেক্ট নেই' বলে দেওয়ার আগে কেউ কি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে দেখছেন কথাটা সত্যি কিনা? দেখছেন না। দেখছেন না, কারণ যাঁদের দেখার কথা সেই বিকল্প চিকিৎসা-পদ্ধতির চিকিৎসকেরা গোড়াতেই কতকগুলো আপ্তবাক্য বিশ্বাস করে বসে আছেন, যেমন—গাছ-গাছড়া মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। চোখের সামনে প্রমাণ তাঁরা দেখতে পাবেন না, উইলো গাছের বাকল কোনও ক্ষতি নাকি করবে না, কিন্তু তার থেকে পাওয়া অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড হলেই ক্ষতি করবে। একে বোধকরি জেগে ঘুমানো বলা যেতে পারে, কেননা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জানে, খালি পেটে উইলো গাছের বাকল খেলে 'সাইড এফেক্ট' হয়। এই না-জেনে না-দেখে, এবং ইচ্ছা করে চক্ষু মুদে থেকে 'পার্শ্বক্রিয়া নেই পার্শ্বক্রিয়া নেই' জপে যাওয়াটা যাঁরা করছেন তাঁরা করছেন, কিন্তু তাঁদের কথা শুনবেন কি না সেটা একান্তই আপনার ব্যাপার। তাই হার্বাল (বা এই একই কায়দায় জেনেশুনে অন্ধ থাকে যেসব বিকল্প চিকিৎসা) চিকিৎসা প্রমাণের ধোপে টেঁকে কি না সেটা দেখে নিন।

চিকিৎসা-নৈতিকতা বনাম ব্যবসা

মুশকিল হল, এই ব্যবসা বন্ধ করা অসম্ভব। ভারত এবং চিন, এ দু'টো দেশই বিকল্প চিকিৎসার বিশাল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা কব্জা করতে বদ্ধপরিকর। যদিও পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের জনসাধারণের অধিকাংশই আধুনিক ওষুধই বেশি ব্যবহার করে, পরিপূরক ও বিকল্প চিকিৎসার উন্নতিতে ভারত সরকার নিজে প্রধান ভূমিকায় নেমেছে। ভারতের আয়ুর্বেদের প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের ঐতিহ্যগত ওষুধ তথা চাইনিজ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন (CTM)। চাইনিজ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন বিশ্বের বাজারে বেশ নাম ছড়িয়েছে। আয়ুর্বেদও সেই বাজার কব্জা করতে চায়, কিন্তু বাগড়া দিচ্ছে মানুষের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা। চিনের CTM -এর বাজার রমরমা করে চলছে, কারণ তারা এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ আগে থেকে অনুমান করেছিল। ১৯৭২ সালে চিন চাইনিজ ট্র্যাডিশন্যাল মেডিসিন-এর উন্নতিকল্পে, বা বাজার দখলের লক্ষ্যে, এক 'টাস্ক ফোর্স' তৈরি করে, যার উপযোগিতা এখন বোঝা যাচ্ছে।

আয়ুর্বেদিক ওষুধে অতিমাত্রায় সিসা, পারদ ইত্যাদি ‘হেভি মেটাল’ পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে আর্সেনিক। এগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত, সুতরাং সেই সব জিনিস ওষুধে থাকলে কোনও দেশের কোনও মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাকে অনুমোদন দেবে না, আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ মেডিসিন (NCCAM)-এর অনুমোদনও মিলবে না। অতএব তাড়াতে হবে ‘হেভি মেটাল’ ও আর্সেনিক।

ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথির প্রচারের জন্য সরকার সৃস্ট করেছে AYUSH নামক এক সংস্থা। এই সংস্থার প্রাক্তন সচিব শ্রীমতী শৈলজা চন্দ্র, তিনি রায় দিয়েছেন— ভারতের বিকল্প চিকিৎসাকে চিনের বিকল্প চিকিৎসার সাথে পাল্লা দিতে গেলে আগ্রাসী ভূমিকা নিতে হবে। তাঁর বক্তব্য হল, কেবলমাত্র ভারতীয় বিকল্প চিকিৎসার গুণগানে ভরপুর সিডি বা লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করলে চলবে না। আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ মেডিসিন (NCCAM)-এর মতো সংস্থার অনুমোদন অর্জন করতে হবে। শ্রীমতী চন্দ্রর মতে, আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে হৃদ্যতা, আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর মতো শক্তিশালী সংস্থার কাছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আয়ুর্বেদ কার্যকর — এটা প্রমাণ করে দেখানো না যাচ্ছে ততক্ষণ এই হৃদ্যতা সম্ভব নয়। শ্রীমতী চান্দ্রা বলেছেন, সর্বপ্রধান কাজ হল আয়ুর্বেদিক ওষুধের পরিপূর্ণ শুদ্ধিকরণ। আয়ুর্বেদিক ওষুধে অতিমাত্রায় সিসা, পারদ ইত্যাদি ‘হেভি মেটাল’ পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে আর্সেনিক। এগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত, সুতরাং সেই সব জিনিস ওষুধে থাকলে কোনও দেশের কোনও মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাকে অনুমোদন দেবে না, আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ মেডিসিন (NCCAM)-এর অনুমোদনও মিলবে না। অতএব তাড়াতে হবে ‘হেভি মেটাল’ ও আর্সেনিক। তারপর হয়তো তাড়াতে হবে আরও অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ। এরপর জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ দিতে হবে যে আয়ুর্বেদিক ওষুধে আর কোনও ক্ষতিকারক পদার্থই নেই।

সে কি! এই যে সবাই একবাক্যে এত দিন ধরে বলে আসছিলেন আয়ুর্বেদিক ওষুধে কোনও ক্ষতিকারক দিক নেই! তবে কি আমেরিকার মানুষের জন্য যা ক্ষতিকারক আমরা কেষ্টর জীব সেগুলো গুরুবলে দিব্যি হজম করে ফেলি? নাকি আমাদের ওপর যেমন গিনিপিগ বানানো চিকিৎসা সরকারি মদত পেতে পারে কিন্তু সাহেবদের দেশে তেমনটা চালানো যাবে না? তা বেশ, কিন্তু আরও যে একখান প্রশ্ন আছে। সব বাদ-ছাঁদ দিয়ে যেটা শেষ পর্যন্ত ওষুধ হিসেবে গণ্য হবে সেটা কি তখনও আয়ুর্বেদিক ওষুধই থাকবে? তা হলে অ্যাসপিরিনই তো আয়ুর্বেদিক ওষুধ। তাই না?

হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদ দুটোরই উৎপত্তিস্থল, মূলতত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এরা একটা ব্যাপারে একজোট। এরা দুজনেই অ্যালোপ্যাথির বিরোধিতা করে এবং এদের বিরোধিতার কারণ থেকে কায়দাকানুন আমাদের বুঝে নিতে হবে, আর দেখতে হবে সে বিরোধিতার যুক্তি কতটা। স্বাস্থ্যের বৃত্তের পরের সংখ্যায় তা নিয়ে আবার আসব।

লেখক পরিচিতি : রাজা ভট্টাচার্য, মুম্বাই আই আই টি থেকে এম এসসি পাশ করে কলকাতার বোস ইনস্টিট্যুটে পি এইচডি করেছেন; তারপর আমেরিকাতে ফিলডেলফিয়ার টমাস জেফারসন ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ করেছেন। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল এবং হার্ভাড মেডিক্যাল স্কুল (বস্টন)-এ নিউরোলজি নিয়ে গবেষণা করছেন।

পাদটিকা :

(১) বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠক ‘‘হোমিওপ্যাথ রবীন্দ্রনাথ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান’’ (জয়ন্ত দাস, ‘একক মাত্রা’, মে ২০১১, পৃঃ ২৬-৩১ দেখতে পারেন।

(২) ‘Nutraceuticals’- Food, or parts of food, that provide medical or health benefits, including the prevention and treatment of disease.

(৩) ‘আয়ুশ’ বা AYUSH : Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy- এইসব বিকল্প ‘চিকিৎসা’ পদ্ধতিকে এক ছাতার তলায় এনে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিভাগ।

মাথাঘোরা বা ভার্টিগো

বাজারে জিনিসপত্রের দাম শুনে আর রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা শুনেই কেবল যদি আপনার মাথা ঘোরে, কিংবা অফিসের বস, হেডমাস্টার মশাই, বউ, আদালত, পুলিশ— এঁদের দাপটে মাথা ঘুরে যায়, তবে এই প্রবন্ধ আপনার না পড়লেও চলবে। কিন্তু আপনার মাথাঘোরা নামী-দামী ডাক্তারদের বধ করতে ব্রহ্মাস্ত্রও হতে পারে, সুতরাং সাবধান — লিখছেন **ডা. পার্থপ্রতিম পাল।**

মাথা ঘোরার অনেক কারণ আর ধরন আছে। মাথাঘোরার রোগীকে খুব যত্ন করে পরীক্ষা করলে তবেই ধরা যায় কেন মাথা ঘুরছে, আর কী বা তার চিকিৎসা? কিন্তু তার মোদ্দা কথাটা তেমন জটিল নয়।

মানুষ দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হাঁটে, কাজকর্ম করে, অন্য প্রাণীরা সেটা পারে না। এর জন্য মানুষের মস্তিস্ককে একটা বাড়তি কাজ করতে হয়— ভারসাম্য রক্ষা। মস্তিষ্কের সেরেবেলাম অংশ চোখ থেকে, কান থেকে এবং অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশীতে ছড়িয়ে থাকা অবস্থান-স্নায়ুগ্রাহকদের (proprioceptor) পাঠানো তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে মানুষকে খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে, রাখতে, হাঁটতে এবং আনুষঙ্গিক অন্য কাজকর্ম করতে পরিচালনা করে।

মাথা ঘোরা হচ্ছে ব্যক্তির একটা অনুভূতি যখন তার মনে হয় সে চক্রাকারে ঘুরছে অথবা তার চারপাশ চক্রাকারে ঘুরছে। এই অনুভূতি হয় অন্তঃকর্ণের রোগ থেকে।

অন্তঃকর্ণের দু'টো অংশ : সেমিসার্কুলার ক্যানাল এবং ভেস্টিব্যুল। ভেস্টিব্যুল মাধ্যাকর্ষণের প্রেক্ষিতে দেহের অবস্থান বোঝে আর তিনটে সেমি-সার্কুলার ক্যানাল পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করে। এই ক্যানালগুলোর মধ্যে তরল পদার্থ থাকে। এই তরল পদার্থ ঘিরে থাকে স্নায়ুগ্রাহক, তরল পদার্থের অবস্থানগত ও গুণগত পরিবর্তন স্নায়ুগ্রাহকের মাধ্যমে সেরেবেলামে যায়— তখন মাথা ঘোরে।

মাথা ঘোরা, মাথা টলে যাওয়া, মাথার মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে এমন অনুভূতি— এ সমস্ত অসুবিধাগুলো ভারসাম্যগত সমস্যা। অন্তঃকর্ণের রোগ ছাড়াও অন্য যে সব কারণে মস্তিষ্কে অক্সিজেন, পুষ্টি ও জল সরবরাহ কমে যেতে পারে, যেমন রক্তাল্পতা, জলাভাব বা হৃদযন্ত্রের অনিয়মিত স্পন্দন বা স্ট্রোক— এ সব থেকেও মাথা ঘুরতে পারে এবং এগুলো ডাক্তারবাবুরা বিবেচনা করেন।

রোগ নির্ণয় :

রোগের ইতিহাস ও রোগীকে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতে হবে। তারপর প্রয়োজন মতো দু'একটা পরীক্ষা।

স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে চোখের মণি নড়াচড়া করলে পরিভাষায় বলে নিস্ট্যাগমাস (nystagmus)। এটা সাধারণত অন্তঃকর্ণের প্রদাহে হয়। তাই অন্তঃকর্ণজনিত মাথাঘোরার রোগীর চোখে এই লক্ষণ প্রায়শই দেখা যায়।

মেইনারস ডিজিজ বলে একটা রোগ আছে যে রোগে কিছুদিন অন্তর মাথা ঘোরার সঙ্গে, কানে কম শোনা, অনর্গল শোঁ শোঁ শব্দ এবং বমি ও বমিভাব হয়। এই রোগটিও অন্তঃকর্ণ-সম্পর্কিত।

অন্তঃকর্ণের সংক্রমণ ও প্রদাহে হতে পারে labyrinthitis (ল্যাবারিনথাইটিস) বা vestibular neuritis (ভেস্টিব্যুলার নিউরাইটিস)। এতেও মাথা ঘোরার সঙ্গে শোনার সমস্যা হতে পারে।

BPPV বা বিনাইন প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো অন্তঃকর্ণের আর একটি রোগ যাতে মাথা ঘোরে। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথা ঘোরার কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও, আমরা জানি রোগটা বয়স্কদের বেশি হয় এবং অবস্থানগত পরিবর্তনে সৃষ্টি হতে পারে— যেমন নতুন ব্যায়াম, বালিশ বদলানো, চেয়ার বদলানো, ম্যাসাজ ইত্যাদি।

- ❖ অন্তঃকর্ণে আঘাত লাগলে, এমনকী পরিবেশে চাপের তারতম্যে— যেমন কেউ জলে ঝাঁপ দিলে বায়ুর চাপ এবং জলের চাপের ভিন্নতার জন্য মাথা ঘোরা শুরু হতে পারে। একে বলে ব্যারোট্রমা।
- ❖ মাইগ্রেনে মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে বা মাথার যন্ত্রণার আগে মাথা ঘোরা শুরু হতে পারে।
- ❖ স্ট্রোক, টিউমার, খিঁচুনি, ইত্যাদি এবং মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস রোগে মাথা ঘুরতে পাবে, ব্রেনে পুষ্টি বা অক্সিজেন কম গেলে।
- ❖ প্রস্রাব চেপে রেখে অনেকক্ষণ পরে প্রস্রাব করলে মাথা ঘুরতে পারে। এর কারণ হল ভ্যাসোভেগাল অ্যাটাক— এর রেশ অল্পক্ষণ পরেই চলে যায়।
- ❖ রাস্তা পারাপার করছে এরকম মাতাল দেখেছেন? টলে টলে এ পাশ থেকে ও পাশে যাচ্ছে? মদ খেয়ে এই ভারসাম্যহীনতাও অন্তঃকর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে অ্যালকোহলজনিত হ্যাংওভার, যা পরে হয়, তার জন্য দায়ী হচ্ছে ডিহাইড্রেশন। আসলে অ্যালকোহল হজম করতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়, ফলে শরীরে জলের পরিমাণ কমে, যথেষ্ট জল খেলে হ্যাংওভারের সম্ভাবনা কমে।

চিকিৎসা : মাথাঘোরা অনেক ক্ষেত্রে আপনা আপনি ভাল হয়ে যায়। BPPV বা ল্যাবারিনথাইটিস রোগে এপ্‌লে (Epley) পদ্ধতিতে ফিজিক্যাল থেরাপি করলে উপকার হয়। ফিজিওথেরাপিস্টরা ঘরেই যন্ত্রপাতি ছাড়া এই চিকিৎসা করতে পারেন। সফ্‌ট্‌ কলার পরে মাথার নড়াচড়া কমিয়েও কিছু ক্ষেত্রে মাথাঘোরা কমানো যেতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্তঃকর্ণের অপারেশনও করতে হতে পারে।

মাথাঘোরার রোগ হলে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-কানুন মেনে চললে উপকার হবে।

- অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে ধীর গতিতে। শোওয়া থেকে বসা বা বসা থেকে দাঁড়ানো, বিছানা থেকে ওঠা ইত্যাদি সময় নিয়ে করতে হবে যাতে শরীর মানিয়ে নিতে পারে।
- যখন হাঁটবেন, দূরের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। নীচের দিকে বা নিজের পায়ের দিকে না তাকানোই ভাল।
- গাড়ি চড়লে সামনের সিটে বসবেন, সামনের দিকে একটা নির্দিষ্ট বস্তু লক্ষ্য রাখলে উপকার পাওয়া যাবে।
- হাঁটার সময় একটা লাঠি নিয়ে হাঁটলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম। যাদের মাথা ঘোরার রোগ আছে তাদের গাড়ি চালানো, আগুনের কাছে

যাওয়া, মইয়ে ওঠা ইত্যাদি না করাই ভাল।

ওষুধ : ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস, ল্যাবারিনথাইটিস হলে অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টি ভাইরাল (যেমন অ্যাসাইক্লোভির) ব্যবহার করা দরকার হতে পারে।

প্রোক্লোরপেরাজিন বমি ও বমিভাব কমায়। ডায়াজিপাম, সিনারাজিন, সাইক্লিজিন, প্রোমিথাজিন ইত্যাদি ওষুধ বমি ও বমিভাব কমানোর সঙ্গে মাথাঘোরাও কমায়। স্ট্রোক, টিউমার, খিঁচুনি, মাথার চোট ইত্যাদি হলে রোগের কারণ অনুসারে চিকিৎসা করতে হবে।

টীকা : এই নিবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে দু'চারটে শব্দ পরিচিতি দিলে পাঠকদের সুবিধা হবে।

নিষ্ট্যাগমাস (nystagmus): চোখের মণি ও চোখের পাতার অনিয়ন্ত্রিত ও স্বতঃস্ফূর্ত চলন। অন্তঃকর্ণের এবং হাইপোথ্যালামাসের বিক্ষিপ্ত নির্দেশ (signal) এর জন্য দায়ী, সঙ্গে থাকে মাথাঘোরা।

অ্যাপ্লে'স (Epley's) ম্যানুভার: ফিজিক্যাল থেরাপি, বিছানায় শুইয়ে বিভিন্ন ভাবে ঘাড় ও শরীরকে ঘুরিয়ে সেমি-সার্কুলার ক্যানালের তরলে অবস্থিত ক্রিস্টালগুলোকে নিজস্ব জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ফলে মাথাঘোরা চলে যায়।

লেখক পরিচিতি: ডা. পার্থপ্রতিম পাল, এমবিবিএস, জেনারেল ফিজিসিয়ান; হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বহুদিন ধরে চিকিৎসা করছেন।

ক্যুইজ

২১ নং পাতার প্রশ্নের উত্তর

উত্তর : ১। ভুল। আগে স্মলপক্স বা গুটি বসন্তের ক্ষেত্রে গুটির খোসায় জীবাণু থাকত, সেই ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। জলবসন্তের গুটির খোসাতে কোনও জীবাণু থাকে না, বরং খোসা বেরোনোর আগেই রোগ ছড়ায় রোগীর নিঃশ্বাস, কাশি, হাঁচি ইত্যাদির মাধ্যমে।

২। ভুল। যদিও দু'টোই ভাইরাসজনিত অসুখ কিন্তু দু'টো ভাইরাস সম্পূর্ণ আলাদা এবং রোগ লক্ষণও ভিন্ন।

৩। ভুল। যে কোনও সংক্রমণের ক্ষেত্রে সহজপাচ্য খাবার খেতে হয় কিন্তু মাছ-মাংস-ডিম এই সব খাবারে প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে থাকে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। হাম বা পক্সে ভাইরাস সংক্রমণে এমনিতেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, তার মধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাবার না খেলে অন্য সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। নিরামিষাসীদের ডাল, সোয়াবিন, দুধ, ছানা ইত্যাদি বেশি খাওয়া উচিত।

৪। ঠিক।

৫। ভুল। ফল খাওয়া অবশ্যই ভাল। তবে ডাল, ভাত, তরকারি ইত্যাদি দৈনন্দিন খাবারের পরিবর্তে নয়। আমাদের গরিব দেশে প্রবণতা আছে অসুখ করলেই কষ্ট করে সাধারণ খাবার বাদ দিয়েও আপেল, বেদানা ইত্যাদি খাওয়ার চেষ্টা করার— তার কোনও প্রয়োজন নেই।

৬। ঠিক।

৭। ভুল। ঋতুস্রাব একটা স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এই সময়ে অন্য কোনও অসুখের জন্য প্রয়োজন হলে ওষুধ খাওয়াতে কোনও বাধা নেই। সব কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে চলতে পারে।

৮। ভুল। রোগীর রক্ত বা দেহরস কোনওভাবে শরীরে প্রবেশ করলে তার থেকে রোগটি ছড়ায়— যেমন অসুরক্ষিত যৌন সঙ্গমে, সংক্রামিত রক্ত শরীরে প্রবেশ, আক্রান্ত মা-র থেকে গর্ভস্থ শিশুর দেহে। রোগীর সঙ্গে একসঙ্গে অন্য কোনও রকম মেলামেশার দ্বারা HIV-AIDS ছড়ায় না।

৯। ঠিক।

১০। ভুল। বায়োপ্সি রোগ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি, ঠিক জায়গায় অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত ডাক্তারের দ্বারা হলে বায়োপ্সিতে ক্যানসার বাড়ে না; বরং তাড়াতাড়ি ধরা পড়ার ফলে আয়ু বাড়ে।

১১। ভুল। চোখ ওঠা একটি ভাইরাস জনিত রোগ, খুব ছোঁয়াচে ঠিকই, তবে চোখের দিকে তাকালে হয় না— সামান্য সংস্পর্শেই হয়। কালো চশমা ব্যবহার করা হয় এই সময় রোদ থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য।

১২। ভুল। ডাক্তার পরামর্শ দিলেও অনেক বাবা-মা শিশুকে হাঁপানির জন্য ইনহেলার ব্যবহার করতে দেন না। অথচ মুখে খাওয়ার ওষুধের চাইতে ইনহেলারের মাধ্যমে যে হাঁপানির ওষুধ দেওয়া হয় তাতে অনেক অনেক কম মাত্রায় ওষুধ থাকে এবং সেই খুব কম মাত্রার ওষুধই অনেক বেশি কার্যকরী ও অনেক কম ক্ষতিকর।

১৩। ভুল। কুষ্ঠ মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি নামে একটি ব্যাকটিরিয়া জনিত রোগ, রোগটি অল্প ছোঁয়াচে বলে অনেক সময় একই পরিবারে একাধিক লোকের দেখা যায়। বংশগত কারণে নয়।

১৪। ঠিক। নুনের সোডিয়াম আয়ন রক্তচাপ বাড়ায়। অনেক বিদেশি বইতে বলা হয় স্বাভাবিক নুন খাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের খাদ্যাভাস অনুযায়ী, সব খাবারেই নুনের আধিক্য থাকে এবং এই আধিক্যের কোনও মাত্রা নেই। কাজেই নুন কম খাওয়াই ভালো। একেবারে নুন ছাড়া খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ গ্রীষ্মকালে ঘামের সঙ্গে অনেক নুন বেরিয়ে যায়। তাতে আবার সোডিয়ামের ঘাটতি-জনিত সমস্যা হতে পারে।

১৫। ভুল। প্রায় প্রতিটি ব্রণ-র রোগীই ডাক্তারের কাছে এসে এই সমস্যাটা বলেন, এবং তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা এই কারণেই ব্রণ হচ্ছে। ব্রণ হয় মূলত অ্যান্ড্রোজেন নামে একটি হরমোনের প্রভাব, Propinobacterium acnes নামে একটা জীবাণু ও লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে।

এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়
চলে গিয়েছেন ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্য ভাবতে এবং করতে জানতেন।
তাঁকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700 089

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা

একটি সামাজিক সমস্যা

লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতায় ভুগছে আমাদের সমস্ত দেশটাই; বিশেষ করে ভুগছে মেয়ে ও শিশুরা। অথচ সেটাকে দূর করা চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অতীব সহজ কাজ। কেন করা যাচ্ছে না এই অতীব সহজ কাজটা?

প্রশ্ন তুলেছেন **ডা. তন্দ্রা ঘোষ**, *আর উত্তর খুঁজেছেন পাঠককে সাথে নিয়ে।*

রক্তাল্পতা নিয়ে লিখতে গিয়ে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। তখন সবে ডাক্তারি পাশ করেছি, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগে ইন্টার্নশিপ চলছে। রাতে আপৎকালীন ডিউটিতে রয়েছি। রাত দশটা নাগাদ একজন শীর্ণকায়া মহিলাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হল— শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা। স্বামী সঙ্গে ছিলেন, জানালেন, স্ত্রীর বয়স তেত্রিশ, পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হঠাৎ বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখলাম রক্তচাপ খুব কম, হৃদগতি (পাল্‌স রেট) অস্বাভাবিক বেশি, পায়ে শোথ হয়ে ফুলে গেছে। মহিলার কথা বলার ক্ষমতা নেই, চোখের কোলভাগ টেনে রক্তাল্পতা দেখতে গিয়ে শিউরে উঠলাম। একদম ফ্যাকাসে। স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম, তেরো বছরের বিবাহিত জীবনে এটি ওঁদের নবম সন্তান। এর মধ্যে দু'টো নষ্ট হয়েছে। মহিলার আগের সব প্রসবই বাড়িতে থেকে নির্বিঘ্নে হয়েছে। তবে প্রতি বারই কন্যাসন্তান হওয়ায় বংশে বাতি জ্বালানো লোকের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন, মোটামুটি এমনটাই স্থির করেছিলেন। সব ঠিকঠাক ছিল, স্ত্রীর শরীর হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ায় মেডিকেল কলেজের এই দুর্ভাগা ইন্টার্নের কাছে আসতে হয়েছে। মহিলাও ক্ষীণকণ্ঠে জানালেন, তিনি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে টিকাকরণ, বা বাচ্চা হওয়ার আগে ও প্রসবের সময় পাশ করা ডাক্তার, এসবের চেয়ে বাড়িতে পুরোনো প্রথাতেপ্রসবেই স্বস্তিরোধ করেন। মোটামুটি সুস্থ হয়ে বাড়িই ফিরতে চান, ঘনঘন প্রসবের ফলে মায়ের শরীরে কী কী অসুবিধা হতে পারে, তা নিয়ে কোনও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে বলে তিনি বা তাঁর স্বামী মনে করেন না।

আসলে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া যে শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা তা নয়, বিশেষত বঙ্গদেশে তা বিরাট সামাজিক সমস্যা। রাজ্যে ১০-১৯ বছরের মেয়েদের ৯০ শতাংশের বেশির মধ্যে রক্তাল্পতা থাকে, আর ৬ মাস থেকে ৩ বছরের শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা প্রায় ৭০ শতাংশ। সমাজের এই দুই অংশের এত রক্তাল্পতা শুধুমাত্র সমাজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু বলে তা-ই নয়, সমাজের মানসিকতা আরস মাজে মেয়েদেরঅ বস্থাস ম্পর্কেওঅ নেক কিছু বলে দেয়। আমাদের পক্ষে লজ্জার কারণ এই যে, ৮০-৯০ শতাংশ রক্তাল্পতা হয় অপুষ্টি অবহেলা ও অশিক্ষার জন্য। শিশুদের ক্ষেত্রে কিছু রক্তাল্পতা হয় থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি জিনগত অসুখের জন্য। এই রক্তাল্পতার বেশির ভাগটাই রোধ করা যায়।

রক্তাল্পতার অর্থ ও উপসর্গ

রক্তাল্পতার অর্থ হল শরীরে স্বাভাবিকের তুলনায় কম 'রক্ত'-র উপস্থিতি। এখানে 'রক্ত' বলতেব ুঝতেহ বেব. ক্তেরে লোহিতব. ক্তকণিকার পরিমাণকে, যে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে প্রায় পুরোটা জুড়ে থাকে হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের প্রধান অংশ হিম বা আয়রন-যুক্ত অংশ। এই অংশটিকে গ্লোবিন বা প্রোটিন অংশ এমন ভাবে ঘিরে থাকে যে অক্সিজেন অতি সহজেই হিম অংশের আয়রনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, আয়রনকে জারিত না করেই। তাই প্রয়োজনে অক্সিজেন আয়রন থেকে সহজে বিযুক্তও হতে পারে। অক্সিজেন যুক্ত ও বিযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি অক্সিজেনের আংশিক চাপের ওপর নির্ভর করে, যেখানে অক্সিজেনের আংশিক চাপ বেশি সেখানে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়— যেমন ফুসফুস। আবার যেখানে অক্সিজেনের আংশিক চাপ কম, যেমন শরীরের বিভিন্ন কোষকলা, সেখানে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। আসলে শরীরে সামগ্রিক প্রক্রিয়াগুলো সচল রাখতে হলে প্রতিটা কোষেরই নিজস্ব শক্তি দরকার, না হলে কোষটি সক্রিয় থাকতে পারবে না।

কোষে এই শক্তি উৎপাদন হয় বিভিন্ন খাদ্যবস্তুকে (যেমন গ্লুকোজ, প্রোটিন, ফ্যাট) জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। জ্বালানিকে জ্বালানোর কাজটা অক্সিজেনের, তাই অক্সিজেনকে ফুসফুস থেকে বিশেষ বাহক হিমোগ্লোবিনের দ্বারা বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়। অক্সিজেনের রক্তরসে দ্রাব্যতা অনেক কম, তাই কেবলমাত্র রক্তরসের সাহায্যে খুব অল্প অক্সিজেন পরিবাহিত হতে পারে।

সুতরাং রক্তে লোহিত রক্তকণিকা বা হিমোগ্লোবিন দু'টোর কোনওটিরই পরিমাণ কমে গেলে রক্তাল্পতা হতে পারে। রক্তাল্পতা হলে শরীরে শক্তি কম উৎপন্ন হবে, ফলে দেখা যাবে ঝিমুনি ও ক্লান্তিভাব। হৃদযন্ত্রকে বেশি কাজ করতে হবে, কারণ একই রক্তকে বারবার পাম্প করে সে 'ম্যানেজ' করার চেষ্টা করবে, কিন্তু এতে হৃদগতি বেড়ে যাবে যার ফলে দেখা যাবে বুক ধড়ফড় করা। ভারী কাজ করলে সিঁড়ি ভাঙা বা দৌড়তে গেলে শ্বাসকষ্ট হবে। আর দীর্ঘদিন হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি হলে ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্রের পাম্পটিও জবাব দিতে শুরু করবে, যার ফলে হবে শোথ বা পায়ে জল জমা। শিশুদের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা হলে বাড়তি পাওনা হয় আচরণের সমস্যা, শেখার সমস্যা, মনে রাখার সমস্যা।

রক্তাল্পতাকে অপুষ্টির কারণে বলা হয় কেন?

রক্তাল্পতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন লোহিত রক্তকণিকার কম উৎপাদন, হিমোগ্লোবিনের

Acne, Hair Fall, Vitiligo – Do **NOT** Despair.
All are Treatable.
Consult your Dermatologist

ALKEM
Derma Care
Adding Value to Skin Care

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

কম উৎপাদন, লোহিতকণিকার আয়ুষ্কাল কমে যাওয়া (স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ১২০ দিন) বা দেহ থেকে বিভিন্ন কারণে রক্তক্ষরণ হওয়া। রক্তে লোহিত রক্তকণিকার আকার ও তার রঙের ঘনত্ব দেখে রক্তাল্পতার কারণ মোটামুটি ভাবে আন্দাজ করা যায়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণে দেখলে লোহিত রক্তকণিকা ছোট ও তুলনায় ফ্যাকাসে দেখায়, অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন কম আছে। এখন হিমোগ্লোবিন তৈরিতে আয়রন বা লোহার ও প্রোটিন বা গ্লোবিন এই দু'য়েরই ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই দু'টোই উৎস কিন্তু খাদ্য। তাই

মহিলা ও শিশু, যাঁদের শরীরে আয়রনের সঞ্চয়-ভাণ্ডার কম (নিয়মিত রজস্রাব মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি কারণ), তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়মিত আয়রন যুক্ত খাবার খাওয়া অত্যন্ত দরকার। অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতা বেশি হওয়ার জন্য মহিলা ও শিশুদের দেহে অন্যান্য ভিটামিনের অনুপস্থিতির চিহ্নও দেখা যায়। গর্ভবতী মহিলারা ও যেসব মায়েরা বাচ্চাকে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ান তাঁদের শরীরে আয়রনের চাহিদা আরও বেশি, কারণ মাতৃগর্ভে বা মাতৃদুগ্ধে বাচ্চা আয়রন পায় মার কাছ থেকেই।

লোহাযুক্ত খাবার অতি কম খরচেই পাওয়া যায়, যেমন বিভিন্ন শাকসবজিতে (পালং শাক, কচুশাক) লোহার পরিমাণ বেশি থাকে। তাই লোহার অভাবে রক্তাল্পতা পারিবারিক ও সামাজিক অবহেলার পরিচয় দেয়। আর একটা কারণে লোহা জনিত রক্তাল্পতা হয় তা হল অংকুশ-কৃমির (হুক ওয়ার্ম) সংক্রমণ, যা যথাযথ পরিচ্ছন্নতা বিধির (স্যানিটেশন পদ্ধতি) দ্বারা আটকানো যায়। গ্রামাঞ্চলে অংকুশ-কৃমির সংক্রমণ অত্যন্ত বেশি, তাই লোহা জনিত রক্তাল্পতা সামাজিক শিক্ষার অভাবও সূচিত করে।

তবে নারী ও পুরুষদের মধ্যে রক্তাল্পতা আরও নানা কারণে হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, পেপটিক আলসার থেকে ক্ষরণ, ক্যানসার বা কর্কট রোগের উপস্থিতি। মনে রাখতে হবে, লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনে বৃক্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এরিথ্রোপোয়েটিন লোহিত কণিকার উৎপাদন বাড়ায়। লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয় অস্থিমজ্জায় (পূর্ণবয়স্কের ক্ষেত্রে), এ কারণে বৃক্কজনিত বিভিন্ন অসুখে রক্তাল্পতা দেখা যায়। এমনকী যে সব রোগে বৃক্কের ক্ষতি হয়, যেমন ডায়াবেটিস (মধুমেহ), সে ক্ষেত্রেও রক্তাল্পতা দেখা যেতে পারে।

রক্তাল্পতা রোধে কী করা দরকার :

যেহেতু পশ্চিমবাংলায় মহিলা ও শিশুরা অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতায় বেশি ভোগেন তাই মানুষকে এ বিষয়ে ক্রমাগত সচেতন করা ও যে সব লোহাযুক্ত খাবার সহজেই পাওয়া যায় সেগুলো নিয়মিত খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া দরকার। লোহাযুক্ত খাবার কী কী? বিভিন্ন সতেজ শাক (পালং শাক, কচুশাক) বীন, মাংস, লিভার বা যকৃৎ। গরিবদের খাদ্য গেঁড়ি গুগলি বা শামুকের মাংসতেও লোহা পাওয়া যায়। লোহার শোষণে সাহায্য করে ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাবার। তাই লোহার সঙ্গে ভিটামিন 'সি' খেলে লোহার শোষণ ভাল হয়। এছাড়া যেহেতু অংকুশ কৃমির সংক্রমণ গ্রামাঞ্চলে বেশি, তাই মাঝে মাঝে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো ও যথাযথ স্যানিটেশনের সচেতনতার প্রসার করাও দরকার। এছাড়া ঘনঘন প্রসব যাতে না হয় সেটা দেখা দরকার, আর প্রসবের আগে ও পরে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

রক্তাল্পতা ধরা পড়লে কী করা উচিত?

প্রথমত কারণ অনুসন্ধান করা, যার প্রাথমিক ধারণা রক্তকণিকার আকার ও রঙের ঘনত্ব দেখে বোঝা যাবে।

- আগে প্রাথমিক কারণের চিকিৎসা করা - যেমন অর্শ বা পেপটিক আলসার অথবা কর্কটরোগ। কোনও ক্ষেত্রে, যেমন থ্যালাসেমিয়াতে,উপযুক্ত চিকিৎসা নেই, রক্ত দেওয়াই চিকিৎসা।
- লোহাজনিত রক্তাল্পতা হলে তার প্রকোপ বুঝে চিকিৎসা করা। **রক্তাল্পতা ধরা পড়লেই আয়রন বড়ি খেতে হবে এমনটা নয়।** দেখতে হবে সেটা লোহাজনিত রক্তাল্পতা কি না। তারপর রক্তাল্পতা খুব বেশি থাকলে রক্ত দেবারও দরকার হতে পারে। না হলে লোহার লবণ ট্যাবলেট হিসেবে খেতে দিতে হবে। লোহাযুক্ত ট্যাবলেট খেলে খালিপেটে খাওয়া ভাল। তাতে শোষণ ভাল হয়। চা, কফি, অ্যান্টাসিড লোহার শোষণে বাধা দেয়। রক্তাল্পতা ঠিক হওয়ার পরেও তিন থেকে ছয় মাস ওষুধ খাওয়া উচিত। তাতে লোহার সঞ্চয় ভাণ্ডার বাড়ে। গর্ভবতী মাকে প্রথম ভাগে নিয়মিত লোহাযুক্ত ট্যাবলেট খেতে বলা হয়।

রক্তাল্পতা ঘিরে অসাধু ব্যবসা

লোহাযুক্ত লবণের মধ্যে ফেরাস সালফেট সবচেয়ে সস্তা, যা জেনেরিক নামে পাইকারি হিসেবে পাওয়া যায়। ১০০০টা ট্যাবলেটের দাম প্রায় ৫০ টাকা পড়ে। সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় পাওয়া যায়।

কিন্তু আজকাল ওষুধের দোকানগুলোতে ফেরাস সালফেট বড়ি পাওয়াই যায় না। যা পাওয়া যায় তা হল নানা ব্র্যান্ডনামে ফেরাস ফিউমারেট, গ্লুকোনেট ও সাকসিনেট ইত্যাদি লোহার লবণ, আর সেটাও কেবল লোহা হিসেবে পাওয়া যায় না বিভিন্ন ভিটামিনের মিশ্রণে তৈরি দামি সিরাপ বা ট্যাবলেট হিসেবে কোম্পানিগুলো বাজারে ছাড়ে। মনে রাখতে হবে, ফেরাস সালফেট অন্যান্য যৌগগুলোর মতোই সক্রিয়। আর আয়রনের সঙ্গে ফিক্সড ডোজ কমবিনেশনে একমাত্র যে ভিটামিন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যক ওষুধ তালিকায় আছে তা হল ফলিক অ্যাসিড। অন্য কোনও যৌগই অত্যাবশ্যক তালিকায় নেই। এ সবই ওষুধ কোম্পানীগুলোর অসাধু প্রচেষ্টার ফসল।

শেষ কথা : রক্তাল্পতা নিয়ে বলতে গিয়ে লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা নিয়েই কেবল কথা বললাম, কারণ একজন ভারতবাসী হিসেবে আমার লজ্জা হয় যখন দেখি ১০ থেকে ১৯ বছরের মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন এই রক্তাল্পতায় ভুগছে। অথচ এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য কোনও হাইটেক ওষুধ, কোনও বিশাল গবেষণাগার, কোনও বিরাট মাপের ব্যয়বরাদ্দ — এ সব কিছুই লাগে না। লাগে সচেতনতা, লাগে সদিচ্ছা, লাগে পিছিয়ে থাকা মানুষের (বিশেষ করে মেয়েদের) স্বত্বাধিকার।

স্বাধীনতার পরের ৬৫ বছর আমাদের এটুকুও দেয়নি। এ বার কি তা হলে ছিনিয়ে নেওয়ার পালা?

লেখক পরিচিতি : ডা. তন্দ্রা ঘোষ, এমবিবিএস, এমডি, কলকাতার একটা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

স্তন ক্যানসার

আমাদের চেতনায় ক্যানসার তো একটি রোগের নাম নয়, এ এক চরম দন্ডাজ্ঞা, জীবনের বহতা স্রোত থেকে নির্বাসিত হয়ে মৃত্যুর হতাশায় নিমজ্জন। সুতরাং যতক্ষণ পারা যায় আমরা চোখ বুঁজে থাকি, অস্বীকার করি আমাদের শরীরে বেড়ে ওঠা মৃত্যুদূতকে। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? মেয়েদের বড় প্রাণঘাতী ক্যানসার হল স্তনের ক্যানসার, অথচ তাকে অনেকটা আটকানো যায়, শুধু ঠিক সময়ে ঠিক ব্যবস্থা করতে হবে — **লিখছেন ডা. সুজয় বালা।**

গল্প নয়, সত্যি (১)

আমাকে চিনবেন না, চেনার দরকারও নেই। শুধু এটুকু জানলেই যথেষ্ট যে আমি দু'টো সন্তানের মা এক মধ্যবয়স্কা নারী। বিয়ের পর কুড়ি বছর সুখেদুঃখে কেটে যাবার পরে একদিন হঠাৎ দেখলাম, আমার ডানদিকের স্তনে একটা মার্বেলের সাইজের গোটা হয়েছে। ব্যাথা নেই, সুতরাং কাউকে কিচ্ছুটি বলিনি। আর স্তনের ব্যাপার, লজ্জাস্থান, কাকেই বা বলা যায়, বললে যেন হাটের মাঝে উলঙ্গ লাগে নিজেকে, তাই না? কিন্তু বুকের সেই মার্বেলটা বাড়তেই থাকল, ক্রিকেটবলের সাইজ দাঁড়িয়ে গেল সেটা ... ডাক্তারের কাছে যাব না স্বামীকে বলব? শেষমেশ কাছেপিঠের এক আবাল্য-পরিচিত বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারকাকুকে দেখলাম, আমাদের ছোটোখাটো জ্বরজ্বালায় উনিই ডাক্তার। ভালই হল, উনি বললেন, 'আরে, কিচ্ছু নয় রে মা, এই নে ওষুধ', বলে একশিশি বেশ মিষ্টি ওষুধদানা ধরিয়ে দিলেন— হোমিওপ্যাথি ওষুধ। প্রথমে নাকি গোটাটা বাড়বে একটু-আধটু, তাতে ভয়ের কিছু নেই, কেননা তার পর সেটা গলে যাবে এক্কেবারে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্তমনে ওষুধ খেতে খেতে ঘরকন্না করতে লাগলাম, আর কম্পাউন্ডারকাকুর কথা ফলতে লাগল, বাড়তে লাগল গোটাটা, অস্তে আস্তে আমার ডানদিকের বুকটা পুরোটাই শক্ত একটা চাকায় পরিণত হল। তারপর একদিন এল বহু আকাঙ্খিত সেই দিনটি — একটা ছোট্ট ফুটোমত দেখা দিল চাকাপানা ওই ফোলাটার ওপর, বুঝলাম এইবার ওটা মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু একি? যাচ্ছে না তো? আর কী দুর্বল যে হয়ে পড়ছি দিন-কে-দিন, একটু কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে উঠি। আমার স্বামী —পতিনিন্দা করতে নেই, খুবই ভালমানুষ, তবে হাতের কাছে সবকিছু গোছানো না পেলে পুরুষমানুষ বিয়ে করে বউ আনবেই বা আর কী জন্য — একটু একটু করে ক্ষেপে দুর্বাসা হয়ে উঠছে — আর গোদের ওপর বিষফোঁড়া শুরু হল আমার পিঠেব্যথা—কী যে করি এখন? ভরসা পেতে কম্পাউন্ডারকাকুর কাছে দৌড়ালাম, তিনি এ বার আর সান্ত্বনা দিলেন না, বরং বললেন — যাও, বড় ডাক্তার দেখাও।

মাত্র ছ'মাস আগেকার কথা, কিন্তু এখন মনে হয় সে যেন গতজন্মের। এখন যে আমি জেনে গেছি, আমার স্তনে ক্যানসার হয়েছে, এ-জীবনের লীলাখেলা শেষ হতে চলেছে। ছ'মাস আগে কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন—জানতাম না এই পরিণতি এত দ্রুত — জ্ঞানচক্ষু খোলেনি তো, তাই বেশ ছিলাম মায়ায় জড়িয়ে। কিন্তু জীবন বড্ড নিষ্ঠুর, স্বপ্নকে সে ক্ষমা করে না, একদিন যখন ঘুম ভাঙে তখন শেষ ঘুমের দিন ঘনিয়ে আসে...।

বাস্তব অবস্থা কী রকম?

বিশ্বে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় হয় যে ক্যানসার তা হল স্তন-ক্যানসার। ভারতে শহরাঞ্চলে স্তন-ক্যানসার সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্যানসার, আর গ্রামাঞ্চলে জরায়ুমুখের ক্যানসার সংখ্যায় প্রথম হলেও থাকলেও দ্বিতীয় স্থানে ওই

> ভারতে শহরাঞ্চলে স্তন-ক্যানসার সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্যানসার

স্তন-ক্যানসারই। যদি মোট রোগীর সংখ্যার কথা ধরি, এক লক্ষ পনেরো হাজার মেয়ের স্তন-ক্যানসার প্রথম ধরা পড়েছে এক বছরে, ২০০৮ সালে। আর ঐ ২০০৮ সালেই চুয়ান্ন হাজার মেয়ে স্তন-ক্যানসারে মারা গেছেন। ক্যানসারে মৃত্যুর কারণ হিসেবে স্তন-ক্যানসারের স্থান দ্বিতীয়। ভারতে স্তন-ক্যানসারে মৃত্যুর হার অন্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি, কেননা এখানে মেয়েরা বড্ড দেরি করে ঠিক চিকিৎসাটা নিতে আসেন।

১৯৮০-র দশক থেকে ভারতে স্তন-ক্যানসার নিয়ে দুর্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে, কেননা এর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যুর লম্বা মিছিল। মনে করা হচ্ছে ২০১৫ সাল নাগাদ স্তন-ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে বছরে এক লক্ষ ছ'হাজারের ওপর, আর ২০৩০-তে সেই সংখ্যা আরও বেড়ে হবে এক লক্ষ তেইশ হাজারেরও বেশি। আমাদের দেশে জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন এসেছে ও আসছে— মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে একটু দেরি করে, প্রথম বাচ্চা হচ্ছে দেরি করে, মায়ের বুকের দুধ কম খাওয়ানো হচ্ছে, ঐতিহ্যবাহী খাবারের বদলে ক্রমশ পাশ্চাত্য ধরনের খাবার চালু হচ্ছে, আর ঘাম-ঝরানো পরিশ্রম কমছে।

স্তন-ক্যানসারের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল বয়স--- বয়স যত বাড়বে স্তন-ক্যানসারের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে। কুড়ি বছর বয়সের নীচে স্তন-ক্যানসার হয় না বললেই চলে, আর মোট স্তন-ক্যানসার রোগীদের মধ্যে মাত্র দুই শতাংশের বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। সবচেয়ে

> বয়স যত বাড়বে স্তন-ক্যানসারের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে।

বেশি স্তন-ক্যানসার হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সীদের মধ্যে। তারপর সম্ভাবনা একটু কমে, কিন্তু সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত স্তন-ক্যানসার ভাল সংখ্যাতেই হয়। অর্ধেকের বেশি স্তন-ক্যানসার হয় মেয়েদের ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবার আগেই, কিন্তু চল্লিশ থেকে সত্তর বছর বয়সীদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

ক্যানসার জিনিসটা কী? টিউমার মানেই কি ক্যানসার?

আমাদের দেহে কয়েক লক্ষ কোটি কোষ আছে। এই সব কোষ বাড়ে, বিভাজিত হয়, নিজের নিজের

জায়গায় থাকে বা নিয়মমতো চলাফেরা করে এবং মরেও যায় বেশ নিয়মমাফিক, আর এই নিয়ম মেনে চলার কাজটা দেখভাল করার জন্য দেহের মধ্যে বেশ জবরদস্ত একটা ব্যবস্থা আছে। ক্যানসার হল সেই রোগ যাতে কিছু কোষ নিয়ম ভেঙে অবিরত অসংখ্যবার বিভাজিত হতে থাকে, আর সে সব কোষ মরে না। ক্রমে এই 'ক্যানসার কোষ' তাদের নিজস্ব জায়গার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, আশপাশের কোষকলাকে আক্রমণ করে, তাদের মেরে ফেলে ... ছড়িয়ে পড়ে রক্তের মাধ্যমে, লসিকানালী বেয়ে ... এবং দূরের নানা স্বাভাবিক কোষের মৃত্যু ঘটায়। ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় নানা অঙ্গ যায় বিগড়ে, তারা কাজ করতে পারে না, আর এই ভাবে এক সময় গোটা মানুষটাই মারা যায়।

সব ক্যানসার 'টিউমার' বা শক্ত ফোলা তৈরি করে না, কিন্তু বেশ কিছু ক্যানসার টিউমার রূপে দেখা দেয়। তা'বলে সব টিউমারই ক্যানসার, তা কিন্তু নয়। টিউমারকে দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, নিরীহ আর সংহারক। এই সংহারক টিউমার, ইংরেজিতে বলে 'ম্যালিগন্যান্ট' টিউমার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হল ক্যানসারঘটিত টিউমার। নিরীহ টিউমার প্রাণনাশ করে না, আশেপাশের কোষকলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে না, দূরের অঙ্গে ছড়ানোর প্রশ্নই নেই; আর 'ম্যালিগন্যান্ট' টিউমারগুলো এই ক্ষতিগুলোর সবকটাই করতে ওস্তাদ। স্তনের ক্যানসার হল এই রকমই ম্যালিগন্যান্ট (সংহারক) টিউমার।

❖ স্তন-ক্যানসার জিনিসটা কী?

স্তন-ক্যানসার স্তনের কোষ থেকে শুরু হওয়া টিউমার। একটা ক্যানসার-কোষ বিভাজিত হয়ে দু'টো, দু'টো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা - ষোলোটা - বত্রিশটা এইভাবে ক্যানসারকোষ বাড়তে থাকে, ক্রমে তা গোটা স্তনটাকেই অধিকার করে বসে। আর এই বাড়তে বাড়তেই প্রথমে স্থানীয় লসিকাগ্রন্থিতে (সাধারণত বগলে শক্ত ব্যথাহীন গোটা হওয়া), আর তারপরে দূরের অঙ্গে (হাড়, লিভার, ফুসফুস, মস্তিষ্ক) তা ছড়িয়ে পড়ে। মূল ক্যানসারটাকে দ্রুত ধরতে পারলে, তার চিকিৎসা করতে পারলে, এই ছড়িয়ে পড়াটা আটকানো যায়।

❖ স্তনে সব ফোলাই ('লাম্প') কি ক্যানসার?

না, সত্যি কথা বলতে কি স্তনের 'লাম্প' বা টিউমারের দশটার মধ্যে আটটাই হল নিরীহ — ফাইব্রোঅ্যাডেনোসিস, ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা —এই সব। সুতরাং স্তনে টিউমার হয়েছে দেখলেই ঘাবড়ে যাবার কারণ নেই। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে, কেননা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ডাক্তারই কেবল বলতে পারবেন কোনটা ক্যানসার।

❖ ক্যানসার কেমন চেহারা নিয়ে প্রকাশ পায়?

অধিকাংশ স্তন-ক্যানসার মোটামুটি শক্ত থেকে খুব শক্ত, ব্যথাহীন ফোলা হিসেবে প্রকাশ পায়। এগুলো স্তনের মধ্যে বেশি নাড়ানো - চাড়ানো যায় না। আরও পরের দিকে ফোলার ওপরের চামড়ায় কুঁচকানো ভাব, টোল খাওয়া, চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া— এই সব হতে পারে। আবার স্তনবৃন্ত থেকে রক্তসহ রসপড়া—এভাবেও ক্যানসার দেখা দিতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যথা হতে পারে। যেহেতু সব স্তন-ক্যানসারের চেহারা এক রকম নয়, তাই স্বাভাবিক স্তনে যে কোনও অস্বাভাবিকত্ব দেখলেই ক্যানসার আছে কি না খতিয়ে দেখা দরকার।

স্তনে যে কোনও অস্বাভাবিকত্ব দেখলেই ক্যানসার আছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার।

সময়ে চিকিৎসা না করে ফেলে রাখলে ক্যানসার ঘা হয়ে বুকের চামড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তখন বগলে লসিকাগ্রন্থিগুলো বেশ ফুলে যায়। স্তন-ক্যানসার রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার স্তরে চলে গেলে হাড়কে আক্রমণ করার সম্ভাবনা বেশি, তাই হাড়ে ব্যথা হতে পারে, বিশেষ করে শরীরের মাঝখানের হাড় — শিরদাঁড়ার হাড় ও হাত-পায়ের লম্বা হাড়গুলোতে আক্রমণ হবার সম্ভাবনা বেশি। তার পরেও চিকিৎসা ঠিকঠাক না হলে লিভার, ফুসফুস, মস্তিষ্কে ছড়িয়ে মৃত্যু।

❖ স্তন-ক্যানসার কী করে সুনির্দিষ্টভাবে ধরা পড়ে?

চিকিৎসকের ক্যানসার সন্দেহ হলে 'ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন' বা 'কোর নিডল' বায়োপ্সি করে ক্যানসার হয়েছে কি না নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। একটা ইঞ্জেকশন সুচের মতো, কিন্তু একটু মোটা সুচ, স্তনের ফোলাটার মধ্যে ঢুকিয়ে সেখান থেকে খানিক কোষকলা টেনে নিয়ে প্যাথোলজিস্টরা অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখে চূড়ান্ত নিদান দেন।

লাখ টাকার প্রশ্ন — স্তন ক্যানসার কি সারে?

আমাদের চেতনায় ক্যানসার তো একটা রোগের নাম নয়, এ এক চরম দন্ডাজ্ঞা, জীবনের বহতা স্রোত থেকে নির্বাসিত হয়ে মৃত্যুর হতাশায় নিমজ্জন। সুতরাং যতক্ষণ পারা যায় আমরা চোখ বুঁজে থাকি, অস্বীকার করি আমাদের শরীরে বেড়ে ওঠা 'মৃত্যুদূত'-কে। ফলে চিকিৎসকের রোগ-নির্ণয় সুনির্দিষ্ট করার পরীক্ষানিরীক্ষা আর চিকিৎসা শুরু করায় দেরি হয়। চিকিৎসার যতটুকু ফল হতে পারত তা হয় না। আর স্তন-ক্যানসার তো আরও সমস্যার, কেননা এটি মেয়েদের সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্যানসার 'গোপন' স্থানের রোগ—সুতরাং অবহেলা ও দেরী করার প্রবণতা বেশি।

স্তন-ক্যানসার সারানোর গ্যারান্টি নেই, কিন্তু আগে ধরতে পারলে বহু স্তন-ক্যানসার সেরে যায়।

সত্যি কথা হল, সব স্তন-ক্যানসার সারানোর গ্যারান্টি নেই,কিন্তু আগে ধরতে পারলে বহু স্তন-ক্যানসার সেরে যায়। যুক্তিটা সহজ। ক্যানসারের শুরুতে থাকে তো একটা মাত্র 'খারাপ' কোষ। একটা ক্যানসার-কোষ বিভাজিত হয়ে দুটো, দু'টো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা-ষোলোটা-বত্রিশটা এই ভাবে ক্যানসারকোষ বাড়তে থাকে, আর দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার সাইজের না-হওয়া পর্যন্ত এটি স্তন-পরীক্ষা করে বোঝা সম্ভব নয়। এই ২ সে.মি. সাইজটাকে আমরা বলতে পারি ক্রান্তিক বা ক্রিটিক্যাল সাইজ। ক্যানসারটি যত সাইজে বাড়ে তত তার কাছের কোষকলাকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা বাড়ে, সম্ভাবনা বাড়ে লসিকা বা রক্তের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ার। দেরি করলে এই সম্ভাবনা বহু গুণ বেড়ে যায়। ভুললে চলবে না, স্তনে থাকা ক্যানসারের জন্য কিন্তু রোগী মারা যান না, মৃত্যু আসে অন্য নানা অঙ্গে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

সুতরাং যত তাড়াতাড়ি ক্যানসার সনাক্ত করা যায় আর চিকিৎসা শুরু করা যায় ততই ভাল। আগে ধরতে পারলে দূরে ছড়ানোর আগেই চিকিৎসা শুরু করার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং সারার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমাদের দেশে স্তন-ক্যানসার যে এত মানুষকে মারে তার জন্য ক্যানসারের মারণ-ক্ষমতা যতটা দায়ী, আমাদের অজ্ঞতা ও

আশাহীন মানসিকতা তার চাইতে কম দায়ী নয়।

আমার স্তন-ক্যানসার আছে—কী চিকিৎসা তার?

মূল চিকিৎসা অপারেশন। হাসপাতালে মাত্র দু'তিন দিন থাকতে হয়, আর দু'সপ্তাহের মধ্যে রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। প্রধানত দুরকমভাবে অপারেশন করা হয়। সচরাচর ধরনটা হল আক্রান্ত স্তনটি ও বগলের লসিকাগ্রন্থিগুলো পুরো বাদ দেওয়া— একে বলে পরিবর্তিত সম্পূর্ণ স্তনকর্তন (Modified radical mastectomy)। আর দ্বিতীয় ধরনের অপারেশন করা যায় কেবলমাত্র সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে টিউমারটা খুব ছোটো অবস্থায় অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে— পুরো স্তন না কেটে ফেলে কেবল টিউমার আর তার আশপাশের খানিক কোষকলা ও বগলের লসিকাগ্রন্থিগুলো বাদ দেওয়া হয়— একে বলে স্তন-বাঁচানো সার্জারি (Breast conservation surgery)। এতে অঙ্গহানি কম হয়, কিন্তু ক্যান্সারের স্থানীয়ভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই ফিরে আসা ক্যানসারকে আবার অপারেশন করা যায়, জীবনহানির সম্ভাবনা বাড়ে না।

স্তন ক্যানসারের বিভিন্ন অপারেশন

টিউমারের সাইজ ও স্তনের বাইরে রোগ ছড়িয়ে পড়ার অবস্থা অনুসারে অপারেশন করার পর বুকের ওপরে 'রে' দিয়ে (অর্থাৎ রেডিওথেরাপি) এবং কেমোথেরাপির দরকার হতে পারে। অনেক সময় অপারেশনের আগেও কেমোথেরাপি দিতে হতে পারে। পুরো চিকিৎসার জন্য মাস-ছয়েক লাগতেই পারে। তারপর ছ'মাস অন্তর ডাক্তার দেখানো, পাঁচবছর ধরে। তারপর পাঁচ থেকে দশ বছরে একবার করে ডাক্তারকে দেখিয়ে যাওয়া।

আমার এখন স্তন-ক্যানসার নেই। ভবিষ্যতের জন্য কিছু করার আছে?

নিজেকে সুরক্ষিত রাখার সেরা উপায় হল স্তন-ক্যানসার হলে তাড়াতাড়ি ধরা যেন পড়ে সেটা

রে দিয়ে স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা

দেখা। তার তিনটে রাস্তা আছে।

১। **নিজের স্তন পরীক্ষা** - কুড়ি বছর বয়সী থেকে প্রত্যেকে প্রতি মাসে নিজের হাতে স্তনের চামড়া পরীক্ষা করবেন, টিপে দেখবেন স্তনের কোথাও কোনও পরিবর্তন হয়েছে কী না। যদি কোনও অস্বাভাবিকত্ব মনে হয় তো শিগগির ডাক্তার দেখাবেন।

❖ **কখন পরীক্ষা করবেন?**

মাসিকের শুরুর দিনটির এক সপ্তাহ পরে, যখন স্তন ফোলা বা ব্যথাভাব থাকে না। যদি মাসিক হবার সময়ের কোনও ঠিকঠিকানা না থাকে, অথবা মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে (মেনোপজ বা সার্জারি করে ইউটেরাস বাদ দেবার জন্য), তা হলে মাসের যে কোনও সুবিধাজনক নির্দিষ্ট দিনে। গর্ভবতী হওয়া বা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য পরীক্ষা করার কোনও অসুবিধা নেই, শুধু দুধ খাওয়ানোর পরে (বা দুধ খাওয়ানো অসম্ভব হলে, দুধটা ফেলে দেবার পরে) পরীক্ষা করবেন।

❖ **কিভাবে পরীক্ষা করবেন?**

কোমরের ওপর থেকে সব কাপড় খুলে শুয়ে পড়ে পরীক্ষা করুন, স্তনের সমস্তটা বুকের খাঁচার

স্তন ক্যানসারে কেমোথেরাপি

ওপরে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে থাকায় আপনার বুঝতে সুবিধে হবে। ডান স্তনের জন্য বাঁ হাতের তিনটে মাঝের আঙুলের পুরোটা দিয়ে— স্তনের ওপর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পয়সার আকারে এক-একটা জায়গা এক-একবার পরীক্ষা করুন। গলার নীচের হাড় থেকে ব্রা-এর একদম নীচের অংশটা যত দূর আসে উপর-নীচে ততটা, আর পাশাপাশি বগল

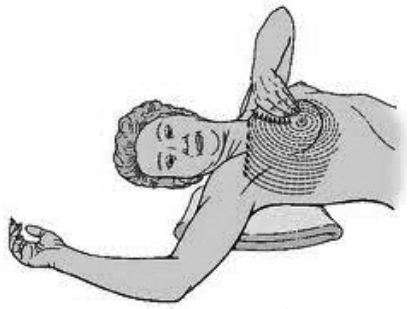

থেকে বুকের মাঝের হাড় পর্যন্ত এইভাবে কমবেশি চাপ দিয়ে দেখুন। বাঁ দিকে একই ভাবে দেখুন ডান হাত দিয়ে। স্নানের সময় একই পরীক্ষা করা যায়। হাতে সাবান থাকলে চামড়ায় ঘষা কম লাগে, আর তাতে স্তনের ভেতরকার কোনও পরিবর্তন ধরতে সুবিধে হয়।

❖ **পরীক্ষা করে কী দেখবেন?**

আপনার স্বাভাবিক স্তন কেমন দেখতে ও তার স্বাভাবিক স্পর্শটা ঠিক কেমন সে টুকু বোঝার ওপরে জোর দিন। তা হলেই কোনও পরিবর্তন হলে সেটা ধরতে পারবেন। কী পরিবর্তন, তার কতটা গুরুত্ব,

সে সব ভালভাবে বোঝা আপনার পক্ষে সম্ভব না হওয়ারই কথা, সুতরাং পরিবর্তন দেখলেই সোজা ডাক্তারের কাছে যান।

স্বাভাবিক :

- একটা স্তন অন্যটার তুলনায় সামান্য বড়।
- স্তনের নীচের দিকে স্তনবৃন্তের একটু তলায় একটা সামান্য শক্ত লম্বা অংশ।
- আপনার ঋতুচক্রের (মাসিকের) সময় অনুযায়ী স্তনের কিছু পরিবর্তন; মাসিক শুরুর আগে একটু ফোলাভাব, স্তন সামান্য ভারী লাগা ও ব্যথার ভাব।
- দুটো স্তনে হাত দিয়ে অনুভব করলে একই রকম নরম/শক্ত লাগা, এবং শেষ যে দিন স্তনপরীক্ষা করেছেন, তার তুলনায় কোনও নতুন গোটা (লাম্প) না থাকা।
- আপনার স্তনদ্বয় আগাগোড়াই অনেক ছোটছোট 'লাম্প' বা গোটায় পূর্ণ হতে পারে। যদি দু'টো স্তনই বরাবর এরকম থাকে তো এটাই আপনার স্বাভাবিক।
- স্তনবৃন্ত থেকে সামান্য জলের মতো বা পাতলা দুধের মতো বেরোতে পারে।

অস্বাভাবিক :

- স্তনের মধ্যে নতুন গোটা বা 'লাম্প' পাওয়া। অধিকাংশ নতুন-পাওয়া লাম্প-এর সাইজ মটরশুঁটির মতো হয়, আর সেগুলোর ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কমই।

'নিজের স্তনপরীক্ষা'-র গুরুত্ব আছে। কিন্তু এটা কোনোমতেই ডাক্তারকে দিয়ে স্তনপরীক্ষা ও ম্যামোগ্রাফির বিকল্প নয়।

- আপনার স্তনে বা স্তনবৃন্তের রং কিংবা অনুভব করে নরম / শক্ত লাগাটা আগের চাইতে অন্য রকম হয়ে যাওয়া। যেমন ওপরটা কুঁচকে যাওয়া, স্থানীয়ভাবে ছোটবড় টোল খাওয়া, একটা জায়গা মোটা বা কড়া লাগা।
- যে স্তনবৃন্ত আগে স্বাভাবিক ছিল সেটা ভেতরমুখো হয়ে যাওয়া (উল্টে যাওয়া)।
- স্তনবৃন্তে লাল দাগ, আঁশ ওঠা, ঘা।
- স্তনবৃন্ত থেকে রক্তযুক্ত বা সবজোটে রস বেরোনো।

সাবধানবাণী

নিজে নিজের স্তন পরীক্ষা করার উপদেশ দেওয়া হয়, কেননা মনে করা হয় মেয়েরা তাতে নিজের স্তনের গঠন ঠিক কেমন তা বুঝতে পারবেন, আর তাতে কী পরিবর্তন হল তাও ধরতে পারবেন। কিন্তু সমীক্ষা করে 'নিজের স্তন পরীক্ষা' ব্যাপারটা স্তন-ক্যানসারে মৃত্যুহার কমায়, এমন দেখা যায়নি। আরেকটা কথা হল, 'নিজের স্তনপরীক্ষা স্বাভাবিক' মানে স্তন-ক্যানসার নেই, তা বলা যাবে না। বিশেষ করে আমাদের দেশে ডাক্তারকে দিয়ে নিয়মিত স্তনপরীক্ষা ও ম্যামোগ্রাফি করানোর প্রবণতা খুব কম, আর চট করে সে-প্রবণতা বাড়বেও না, তাই 'নিজের স্তনপরীক্ষা'-র গুরুত্ব আছে। কিন্তু এটা কোনও মতেই ডাক্তারকে দিয়ে স্তনপরীক্ষা ও ম্যামোগ্রাফির বিকল্প নয়।

২। **ডাক্তারকে দিয়ে স্তনপরীক্ষা** - কুড়ি বছর বয়স থেকে, তিন বছর অন্তর ডাক্তারকে দিয়ে স্তনপরীক্ষা! ডাক্তার ছাড়াও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর্মী পরীক্ষা করতে পারেন; তাঁরা স্তনের চামড়া ও ভেতরকার অংশ বাইরে থেকে পরীক্ষা করেন।

সাবধানবাণী : যে সব দেশে ম্যামোগ্রাফি প্রয়োজনমতো করা হয় সেখানে ডাক্তারকে দিয়ে স্তনপরীক্ষা স্তন-ক্যানসারে মৃত্যুহার কমায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ম্যামোগ্রাফি ইত্যাদির সুযোগ কম, সুতরাং ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়ে দেখানো এখানে স্তন-ক্যানসার প্রথম দশায় ধরার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৩। **ম্যামোগ্রাফি করে স্তনপরীক্ষা** - চল্লিশ বছর বয়স থেকে, এক বছর বা দু'বছর অন্তর।

ম্যামোগ্রাম হল কম জোরালো এক্স-রে ব্যবহার করে (রোগীকে কম বিকিরণ-জনিত বিপদের সম্মুখীন করে) স্তনের এক বিশেষ ধরণের এক্স-রে ছবি যাতে স্তনে ক্যালসিয়াম-জমা বা টিউমার থাকলে তা ধরা পড়ে। এসব দেখলে সেটা ক্যানসার কি না তা জানার জন্য বায়োপ্সি করতে হয়।

শুধু হাতে পরীক্ষা করে যে অবস্থায় স্তন-ক্যানসার ধরা পড়ে, ম্যামোগ্রামে তার চাইতে আগেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ রোগী এই সময় আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক, আর টিউমার সাইজ ক্রান্তিক বা 'ক্রিটিক্যাল' সাইজে (মোটামুটি ২ সেমি) পৌঁছয়নি। এত ছোট অবস্থায় ধরা পড়লে নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার সারানো সম্ভব।

স্তন-ক্যানসার সারানোর ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখতে হবে। যেহেতু পাঁচ-দশ কুড়ি বছর ধরে লাগাতার রোগীর খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয় না, এ-রোগের ক্ষেত্রে দশ বছর রোগী বেঁচে আছেন ও ক্যানসার ফিরে আসেনি—এমনটা হলেই আমরা রোগী সেরে গেছেন বলি। এটা হয়তো পুরো ঠিক নয়, কিন্তু এর চাইতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা এখনও সম্ভব নয়।

❖ আমার মায়ের স্তন ক্যানসার ছিল ; আমার কি ভয় বেশি?

হ্যাঁ, আপনার ভয় আর পাঁচজনের চাইতে বেশিই। পরিবারে স্তন-ক্যানসারের জোরালো ইতিহাস থাকলে স্তন-ক্যানসারের সম্ভাবনা গড়পড়তায় বাড়ে। যদি কোনও নারীর মা বা নিজের বোনের স্তন-ক্যানসার থাকে তো তাঁর স্তন-ক্যানসারের সম্ভাবনা সাধারণের চাইতে দেড় থেকে দু'গুণ বেশি। সুতরাং এই নারীদের ক্যানসার আগেভাগে ধরে ফেলার চেষ্টাটাও বেশি করতে হয়, যেমন ম্যামোগ্রাম চল্লিশ বছর বয়স থেকে শুরু না করে পঁচিশ বছর বয়স থেকে শুরু করতে হয়।

❖ আমার মায়ের তো স্তন-ক্যানসার ছিল, আর

অ্যাঞ্জেলিনা জোলিরও তাই। তিনি স্তন ক্যানসার ঠেকাতে ক্যানসার হবার আগেই দু'টো স্তন কেটে বাদ দিয়েছেন; আমারও কি তাই করা উচিত?

অ্যাঞ্জেলিনার স্তন বাদ দেওয়া নিয়ে মিডিয়া খুব হৈ-চৈ করেছে, আর তাতে বংশানুক্রমিক স্তন-ক্যানসার নিয়ে সবার উৎসাহ বেড়েছে। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে অ্যাঞ্জেলিনার মতো বংশানুক্রমিক স্তন-ক্যানসার তুলনায় বিরল, মোট স্তন-ক্যানসারের ৫-১০ শতাংশ মাত্র। এই গোত্রের (বংশানুক্রমিক) স্তন-ক্যানসার রোগীদের পারিবারিক স্তন-ক্যানসারের জোরালো ইতিহাস থাকে, যেরকম নীচে বলা হল—

- একজন প্রাথমিক রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ৪৫ বছর বয়সের আগে স্তন-ক্যানসার (প্রাথমিক রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় বলতে মা, বাবা, নিজের ভাই, বোন, সন্তান বোঝায়)।
- একাধিক প্রাথমিক রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ৫০ বছরের আগে স্তন-ক্যানসার।
- এক বা একাধিক নিকট রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের (প্রাথমিক বা একটু দূরের সম্পর্ক, যেমন মাসি বা পিসি, মাসতুতো খুড়তুতো ভাইবোন ইত্যাদি) স্তন-ক্যানসার ও ডিম্বাশয় ক্যানসার উভয়ের উপস্থিতি।
- একাধিক নিকট রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ডিম্বাশয়-ক্যানসার।
- কোনও নিকট আত্মীয় পুরুষের স্তন-ক্যানসার।

এই পারিবারিক রোগের কারণ হল একজোড়া জিনগত মিউটেশনের মধ্যে একটা (বিরল ক্ষেত্রে দু'টোই)। এদের নাম BRCA 1 ও BRCA 2 মিউটেশন। এটা এক বংশানুক্রমিক ব্যাধি, তাই মা'র এই মিউটেশন থাকলে সন্তানের মিউটেশন থাকার এবং রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। সম্ভাবনা বেশি বলেই বংশানুক্রমিক স্তন-ক্যানসার রোগীর রোগ হবার আগেই দু'টো স্তন ও দু'টো ডিম্বাশয় বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তার সঙ্গে জরায়ুও বাদ দেওয়া হয়। BRCA 1 বা BRCA 2 মিউটেশন আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে শুধুমাত্র তাদের, যাদের জোরালো পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে।

এই সব ক্ষেত্রে BRCA 1 বা BRCA 2 মিউটেশন পাওয়া গেলে স্তন ও ডিম্বাশয় বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে। তবে এ নিয়ে অনেকে অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি তুলেছেন, বিতর্কও হয়েছে ঢের। বিতর্কের সারবস্তু কিছু নেই তা বলছি না, রোগ হওয়ার আগেই এ রকম বড় অপারেশন করতে আপত্তি হওয়া বেশ স্বাভাবিক, এবং কত জন অত খরচসাধ্য অপারেশন করাতে পারবেন, সেটা ফেলনা প্রশ্ন নয়। এবং অ্যাঞ্জেলিনা যে অপারেশন করিয়েছেন, তাতে বাইরের দিক থেকে স্তন যেন এক রকম দেখায়, তার জন্য অনেক সময়, অর্থ ও সার্জেনের বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে। এরকম অপারেশন সত্যিই এখনও পর্যন্ত প্রায় বিলাসিতা। তবে এরকম জেনেটিক ইতিহাস থাকলে স্তন ও ডিম্বাশয় বাদ দিলে কিছু প্রাণ কম বয়সে ঝরে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, এটুকুই আমাদের বলার কথা।

গল্প নয়, সত্যি (২)

শুরুর গল্পটা মনে আছে তো? আমাকে এবারও হয়তো চিনবেন না, তবে এবার আমি নতুন আমি, দু'টো সন্তানের মা এক মধ্যবয়স্কা, সুখে-দুঃখে দিন কাটে। তবে এই আমি জানি সুস্থ জীবনের জন্য আমার নিজের উদ্যোগ খুব দরকার। তাই স্তন-ক্যানসারের সম্ভাবনা মাথায় রেখে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়মিত পরীক্ষা করাতাম। ডাক্তারবাবু স্তন পরীক্ষা করে কিছু না পেলেও ম্যামোগ্রাফি করাতেন। অনেকেই বলেছিল, খামোকা ঝামেলা, বাদ দাও এইসব। কিন্তু একবার এমন এক 'অকারণ' ম্যামোগ্রাফিতে ১ সেন্টিমিটার একটা গোটা বা টিউমার বাঁ স্তনে ধরা পড়ল। বায়োপসি হল, বেরোল স্তন-ক্যানসার। ডাক্তারবাবু বললেন, সেরে যাবে। ছোট টিউমার, তাই কেবল টিউমারটুকুই কেটে বাদ দেওয়া হল, তারপর পাঁচসপ্তাহের রেডিওথেরাপি। তার পর কেমোথেরাপির ছ'টা কোর্স। তারপর থেকে পাঁচ বছর ধরে আমার হরমোন চিকিৎসা চলেছে। প্রতি ছ'মাস অন্তর আমাকে ডাক্তার দেখাতে হত।

সে সব প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। আমি এখনও নানা কাজে ঠিক আগের মতোই ব্যস্ত, স্বাভাবিক জীবন, প্রায় ভুলেই গেছি আমার ক্যানসার হয়েছিল। আর হ্যাঁ, গত পৌষমাসে আমার নাতনি হয়েছে, মিষ্টি কি মিষ্টি যে দামাল মেয়েটা ...

যে বার্তাটা সবার জন্য

- স্তন ক্যানসার বাড়ছে। ৪০ বছরের বেশি বয়সী সব মহিলারই স্তনক্যানসার নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত।
- প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়লে স্তনক্যানসার সেরে যায়। সুতরাং নিজেকে বাঁচানোর সেরা পথ হল প্রথম পর্যায়ে স্তন ক্যানসার যাতে ধরা পড়ে সেই চেষ্টা করা।
- সেটা করতে গিয়ে ক্যানসার কবে টিউমার বা লাম্প হিসেবে হাতে বুঝতে পারার মতো বড় হবে, তার জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না, ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।
- আপাতদৃষ্টিতে যখন স্বাভাবিক আছেন, তখনই নিয়মিত ম্যামোগ্রাফি করলে ক্ষুদ্র অবস্থায় ক্যানসার ধরা যায়।
- খুব ছোট অবস্থায় (২ সেমি) স্তন-ক্যানসার ধরা পড়লে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সারানো যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুজয় বালা, এমবিবিএস, এমএস, বর্তমানে ক্যানসার সার্জারিতে ডি এন বি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

ভাল হওয়ার মন্দ দিক

স্বাতী ভট্টাচার্য

একটা মেয়ের কথা বলি। যখন ছোট একটা হাত-মোছা তোয়ালেতে তাকে দু-পাক জড়ানো যেত, তখন থেকেই সে খুব ভাল, খুব শান্ত মেয়ে। দুধ খেতে আপত্তি করেনি কখনও, বড়দের কথা শুনে চলেছে, ড্রয়িং ক্লাসে, গানের ক্লাসে, অ্যাবাকাস দিয়ে অঙ্ক কষার ক্লাসে গিয়েছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে। স্কুলে প্রতিটি ক্লাসে উঠেছে ফার্স্ট হয়ে।

স্কুলের শেষ চৌকাঠে এসে সেই মেয়ের ওজন ৭২ কিলোগ্রাম। ব্লাড প্রেশার দেড়শো বাই একশো দশ। হেভি পিরিয়ডের সমস্যার জন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, ওভারিতে অনেকগুলো সিস্ট ধরা পড়েছে। ওষুধ খেতে হয়। মনও খুব খারাপ। একটা ছেলেকে ওর ভাল লাগে, কিন্তু বাবা-মা তার সঙ্গে মিশতে ওকে বারণ করে দিয়েছে। বলেছে, 'এখন ওসবের বয়স নয়, মন দিয়ে পড়ো।' কথাটা তো ঠিক, আর মেয়েটাও ভাল রেজাল্টই করতে চায়, কিন্তু পড়ায় তার মন বসে না। সে বেশ বুঝতে পারছে, হায়ার সেকেন্ডারিতে রেজাল্ট খুব খারাপ হবে। সবাই বুঝে যাবে, ও আসলে ভাল মেয়ে নয়। তখন সে সবাইকে মুখ দেখাবে কী করে? তার চাইতে মরে যাওয়াই ভাল। মাঝেমাঝেই আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে মেয়েটা। টিভি দেখে, গান শোনে মোবাইলে, তবু ওই ভয়ঙ্কর ভাবনার চারপাশে ঘুরতে থাকে ওর মন।

হয়তো ভাল মেয়ে হওয়ার শর্তগুলো না মানলে অনেক ভাল থাকত মেয়েটা। যদি দিনে ১৪-১৫ ঘন্টা বসে বসে বই না পড়ে বেরিয়ে পড়ত বাড়ি থেকে, বন্ধুদের সঙ্গে এলোমেলো ঘুরে বেড়াত রাস্তায়, মাঝে মাঝেই ক্লাস কেটে সিনেমা দেখে ফেরার পথে এক দৌড়ে বাস বা ট্রেন ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসত হি হি করে, বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করে হাসি-কান্না-রাগ-অভিমানের নানা ধাপে বেসামাল হতে হতেও সামলে নিতে নিজেকে, তবে অনেক, অনেক ভাল থাকত ও। কিন্তু খারাপ মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে গিয়ে সে সব কিছুই ও করেনি।

ভাল মেয়ে, ভাল ছেলে হওয়ার শর্ত যে তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থ্য খারাপ করে, তা নিয়ে অল্প কিছুদিন কথাবার্তা শুরু হয়েছে। চিকিৎসকরা বাবা-মায়েদের বকাবকি করছেন, কেন তাঁরা খেলতে দেন না সন্তানদের? কেন খাওয়াচ্ছেন ইনস্ট্যান্ট নুডল, পটেটো চিপস, কেক-পেস্ট্রি, ফাস্ট ফুড? সেই জন্যই তো চড়চড় করে ওজন বাড়ছে, ব্লাড সুগার বাড়ছে, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ছে চল্লিশ না পেরোতে। ঘরে ঘরে মেয়েদের পলিসিস্টিক ওভারি ধরা পড়ছে। এমনকী মাঝ-তিরিশের ছেলেদের মধ্যে নাকি সেক্সুয়াল ডিসফাংশানও ধরা পড়ছে। স্ট্রেস-অ্যাংজাইটি-ডিপ্রেশন নিয়ে ছুটতে হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারে। খেলাধুলো করলে শরীর তো ভাল থাকেই, মনও ভাল থাকে, পড়ায় মনোযোগ বাড়ে। অভিভাবকদের 'সচেতন' হওয়ার প্রেসক্রিপশন

দিচ্ছেন ডাক্তারবাবুরা।

বাবা-মেয়েরা ও সব কথাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। তাঁদের বক্তব্য, ডাক্তারবাবুদের ছেলেমেয়েরা কোন মাঠে খেলে, তা তাঁদের জানা আছে। ''ওই তো ডক্টর সান্যাল, হাজব্যান্ড-ওয়াইফ দু'জন ডাক্তার। ওদের মেয়ে তো সকালে কোচিং ক্লাস থেকে স্ট্রেট স্কুলে যায় এসি গাড়িতে। বাড়ি ফিরে পরপর দুটো টিউটর। মায়ের সঙ্গে শপিং মল ছাড়া আর কোথাও যায় না। এখন টাফ কম্পিটিশনের যুগ, মার্কস ইজ এভরিথিং। গোল দিলে, বাউন্ডারি মারলে, ক'নম্বর বাড়বে শুনি?''

খেলাধুলো স্বাস্থ্যের জন্য, আর স্কুলে স্বাস্থ্যে নম্বর শূন্য, এটা বাবা-মায়ের দোষ নয়। তাকাতে হবে স্কুলগুলোর দিকে। এ রাজ্যে ফিজিক্যাল এডুকেশন শিক্ষকদের একটা সংগঠনের সচিব সুকোমল রায় জানালেন, আগে শরীরশিক্ষা (ফিজিক্যাল এডুকেশন) ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত আবশ্যক ছিল। এখন আর নেই। নেই ফিজিক্যাল এডুকেশনের জন্য নির্ধারিত কোনও নম্বরও। স্কুলগুলো চাইলে রাখতে পারে, না চাইলে নয়। ওই সংগঠনের হিসেব, রাজ্যের ৯৮ শতাংশ স্কুলেই আর যোগব্যায়াম, ব্রতচারী, বা কোনও খেলা শেখার জন্য কোনও সময় রাখা হয় না। বাকি দুই শতাংশ স্কুলে শরীরশিক্ষার সময় বরাদ্দ রয়েছে, তার কয়েকটিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতেও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে ফিজিক্যাল এডুকেশন।

এই তথ্য যদি ঠিক হয়, তা হলে বুঝতে হবে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত রাজ্যের মাত্র দুই শতাংশ স্কুল।

কেন্দ্রের শিক্ষানীতি অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছে স্কুলের খেলাধুলোকে। ২০০৯ সালে লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় বোর্ডের (সিবিএসই) অধীনস্থ সব স্কুলে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন আবশ্যক, একাদশ-দ্বাদশে আবশ্যক। যে কেন্দ্রীয় সংস্থা মডেল পাঠক্রম তৈরি করে (এনসিইআরটি), তাদের 'ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ২০০৫' অনুসারেও স্কুলে আগাগোড়া শরীরশিক্ষা রাখা দরকার। শিক্ষার অধিকার আইনেও স্কুলে খেলার মাঠ থাকা আবশ্যক করা হয়েছে। নতুন সরকার আসার পর এ রাজ্যের শিক্ষানীতিতেও খেলাধুলোর স্থান কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। ২০১১ সালের ১৩ ডিসেম্বর স্কুল শিক্ষা দফতর ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে 'স্পোর্টস পলিসি' বিষয়ে সকলের প্রস্তাব আহ্বান করেছিল। তাতে বলাও হয়েছিল, আরও বেশি সংখ্যায় মেয়েদের ফিজিক্যাল এডুকেশনের আওতায় নিয়ে আসা স্কুলশিক্ষার একটি লক্ষ্য। কিন্তু তারপর আর কাজের কাজ কিছু হয়নি।

অনেকে হয়তো বলবেন, স্কুলে কেন? স্কুলের বাইরেই তো চিরকাল খেলাধুলো করে এসেছে ছেলেমেয়েরা। গ্রামের স্কুলগুলোতে এমনিতেই ক্লাস

হয় না, মাস্টারমশাই-দিদিমণির আসন শূন্য, থাকলেও তাদের ডিউটি করতে হয় জনগণনায় কি ভোটের কাজে। তারপর আবার খেলাধুলোর জন্য ক্লাস? মুশকিল হল, এ রাজ্যে ছেলেরা সারাদিন স্কুলে থাকার পর মাঠে গিয়ে বল পেটালে 'ভাল' থাকলেও থাকতে পারে, ভাল মেয়েরা? ফ্রক ছাড়ার বয়সের পর নেহাত দু'চারটে কোচিং ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব ছাড়া আর কোথায় তাদের ছোটাছুটি করে খেলার জায়গা? যেখানে কোচিং ক্লাস থেকে সন্ধের

পর বাড়ি ফেরার পথটাই ঝুঁকিতে ভরা?

আমার চেনা মেয়েটির মতো কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে যদি নীতি তৈরি করতে হত, তা হলে শিক্ষা নীতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যকে তৈরি করতে হত ক্রীড়া নীতিও। মন্ত্রিত্বে আসার পর মদন মিত্র কেরলের মতো পশ্চিমবঙ্গেও স্পোর্টস নীতি তৈরি করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু মহাকরণে তাঁর দফতরে খবর নিয়ে জানা গেল, তেমন কিছু তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। যে টাকা রাজ্য খরচ করল নানা জেলায় পাড়ার ক্লাবগুলিকে দিয়ে, তাদের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য, সেখানে একটা শর্ত রাখা যেত যে সরকারি অনুদানের অর্ধেক (কিংবা অন্তত এক-তৃতীয়াংশ) খরচ করতে হবে পাড়ার মেয়েদের খেলার সুযোগ তৈরি করতে। তাদের জন্য একটা টেবিল টেনিস বোর্ডই কেনা হোক, কিংবা মাঠে বা সুইমিং পুলে নামার আগে চেঞ্জিং রুম তৈরি হোক, তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোচ রাখা হোক। খুব বেশি টাকা না থাকায় খুব বেশি সুবিধে হয়তো তৈরি করা যেত না। কিন্তু একটা স্পষ্ট বার্তা পৌঁছত, মেয়েদের খেলাধুলোকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং যখন কেন্দ্রে ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন, আর তিনি প্রায়ই স্বাস্থ্যচর্চার পরামর্শ দেন তরুণ-তরুণীদের, তখন এটুকুও করা যেত। আজ যদি ওই সব ক্লাবের অনুদানকে অডিট করা হয় (অডিট হবে, এমন কোনও ইঙ্গিত দেয়নি সরকার, যদিও টাকাটা জনসাধারণের) তা হলে খুব সম্ভব দেখা যাবে, টাকাটা মূলত কাজে লেগেছে এলাকার যুবক ও যৌবনোত্তর পুরুষদের খেলা ও বিনোদনের কাজে (অপাত্রে, অকাজে খরচের সম্ভাবনা না হয় নাই ধরা গেল)। মেয়েদের জন্য ওই টাকার খুব সামান্য অংশই খরচ হয়েছে, এ এক রকম নিশ্চিত। খুব কম ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছে মেয়েরা। সদস্যদের মধ্যেও মেয়ে প্রায় নেই। বেশির ভাগ পাড়ার ক্লাব হল পাড়ার ছেলেদের ক্লাব। যেখানে এক সঙ্গে অনেক ছেলে, সে জায়গাগুলোকে বরং এড়িয়েই চলে 'ভাল' মেয়েরা।

মেয়েদের খেলাধুলোর জন্য সরকার কী করছে, বললে ক্রীড়া দফতরের কর্তারা বোঝেন, নানা স্পোর্টে প্রতিযোগী মেয়েদের সরকার কতটা সাহায্য করছে। সেটা নিশ্চয়ই দরকারি, কিন্তু খেলাধুলো মানেই তো আর পেশাদারি প্রতিযোগিতা নয়। স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলো, ব্যায়ামের প্রয়োজনটাও স্পোর্টসের নীতির মধ্যেই পড়ে। ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চা যে রাষ্ট্রের কাছে জরুরি, সে বার্তাটা পৌঁছে দিতে যুক্তরাষ্ট্রে মিশেল ওবামা স্বয়ং 'চাইল্ড ওবিসিটি' (শিশুদের স্থূলতা) প্রতিরোধের মুখ হয়েছেন। এখানে তেমন কোনও মুখ নেই, কোনও বক্তব্য নেই, কোনও নীতি-যোজনা প্রকল্পে তার প্রতিফলন নেই। তাই খেলাধুলোর সুযোগ নেই স্কুলে, নেই পাড়ায়। কেবল শহর, শহরতলিতে নয়, গ্রামগুলোতেও ছবিটা তেমনই। সমাজ কিংবা সরকার, কোনও দিক থেকে কোনও ইঙ্গিত মিলছে না যে, বেড়ে ওঠার জন্য লেখাপড়ার মতো খেলাধুলোও জরুরি। কিশোরী, তরুণী মেয়েদের কী করে আনা যায় শরীরচর্চায়, শিক্ষানীতি আর ক্রীড়ানীতি, দুই-ই সে প্রশ্নে নীরব।

আর যেটা কিশোরীদের বাস্তবিক কাজে লাগত, 'জীবনশৈলী শিক্ষা'-র সুযোগে বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে জানা, নিজের শরীর-মন-যৌনতার মূল কথাগুলিকে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ, ফিসফিসানো ভয়-লজ্জা থেকে বেরিয়ে শরীরবিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞানের আলোয় আত্মপরিচয়, সে সম্ভাবনাও স্কুলগুলোতে শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে গেল। এই একটা বিষয়ে লিঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে দলীয় রাজনীতির একেবারে প্রত্যক্ষ একটা যোগ রয়েছে। বিজেপি-শাসিত আটটি রাজ্যে প্রথমে তুলে দেওয়া হল সেক্স এডুকেশনের পাঠক্রম। বাম-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে মুখে 'জীবনশৈলী শিক্ষা' নিয়ে নেতারা অনেক বড় বড় কথা বললেও, কাজের বেলায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে, কোনও 'ওরিয়েন্টেশন' না করিয়ে, বিষয়টাকে কার্যত নির্বাসন দেওয়া হল। শিক্ষকরা কী ভাবে ক্লাসে 'ওসব' বলবেন, এমনই আপত্তি ছিল। গত বছর জুলাইয়ে অবশ্য হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের কর্তারা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত 'অ্যাডলেসেন্ট এডুকেশন' পড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, নবম-দশমে তো প্রশ্নই নেই, একাদশ-দ্বাদশেও সেক্স এডুকেশন পড়ানো হবে না। যে রাজ্য নাবালিকা-বিবাহ, নাবালিকার মাতৃত্বে দেশের মধ্যে প্রায় শীর্ষে, সেখানে এমন নীতিই দরকার বটে। অথচ স্কুলে একেবারে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপেধাপে নিজের শরীর সম্পর্কে চেনাবোঝার জন্য চমৎকার একটা পাঠক্রম তৈরি করেছিল এনসিইআরটি। তাতে দেহের যে কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যৌনাঙ্গের কোনও বিশেষ তফাত না করে, নিজের গোটা শরীরটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখানো হয়েছিল। সে পাঠক্রম এ রাজ্যের কোনও স্কুলের ক্লাসে পড়ানো হয়নি। ফলে ঋতুস্রাবকে আজও মেয়েরা 'নোংরা' মনে করে, প্রেমে পড়াকে 'অসভ্যতা'। মেয়েদের ভাল থাকার সম্ভাবনা প্রথমেই এ ভাবে খারিজ করে দেয় শিক্ষানীতি।

আর স্বাস্থ্যনীতি কী ভাবছে কিশোরীদের জন্য? ২০০২ সালে স্বাস্থ্যনীতি বলে সরকার যা প্রকাশ করেছে, তা পড়তে শুরু করলে মনে যে ভাবটা জাগে, তা আলোকিত কোনও ঘরে প্রবেশ করার অনুভূতি নয়। বরং মনে হয়, নিকষ অন্ধকার কোনও ঘরে হঠাৎ হঠাৎ ফস করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠছে, তার তখুনি ঠাহর করতে হচ্ছে, আশেপাশে কী রয়েছে। সরকার টের পেয়েছে, ম্যালেরিয়া-ডায়ারিয়ার মতো অসুখের সঙ্গে ডায়াবিটিস-ক্যান্সারের মতো 'লাইফস্টাইল' অসুখও বাড়ছে, তার প্রতিরোধও আলাদা। কিছু ব্যবস্থা চাই এমন লোকেদের জন্য যারা খেতে পায় না। কিছু এমন মানুষদের জন্য যারা অতিরিক্ত খায়। কিন্তু কার জন্য কী যে চালু করা দরকার, আর কী বন্ধ করা দরকার, তা স্পষ্ট বলাও হয়নি, করাও হচ্ছে না। কিশোরীদের পুষ্টিকর খাদ্য দরকার, সরকার

সেটা টের পেয়েছে। সে জন্য স্কুলে মিড ডে মিলের ব্যবস্থাও রয়েছে, যদিও এ রাজ্যে এখনও অষ্টম শ্রেণিতেই তার পালা শেষ। বাড়তি পাওনা বলতে আয়রন ট্যাবলেট।

কয়েকটা মেডিক্যাল কলেজে 'অ্যাডলেসেন্ট ক্লিনিক' খোলা হল, কিন্তু নানা বিভাগের ডাক্তারদের নিয়ে 'ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস'-এর যে ধারণা ছিল, তা তেমন ভাবে হল না। মূলত গর্ভপাত আর গর্ভনিরোধকের বিষয়ে পরামর্শের কেন্দ্রই হয়ে রইল। আর এখানে এলে কী পাবে কিশোর-কিশোরীরা, তা নিয়ে তেমন কোনও প্রচার না হওয়াতে খুব কম ছেলেমেয়েই এই সব ক্লিনিকের নাগাল পায়। আমার চেনা মেয়েটি এমন কোনও ব্যবস্থার কথা জানত না, তা আমি জানি। আরও জানি যে এ রাজ্যে জননীমৃত্যুর সংখ্যা (মেটার্নাল মর্টালিটি) যে কমে না, তার একটা কারণ গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃত মেয়েদের সংখ্যা কমে না। 'ভাল' মেয়েরা যেহেতু গর্ভপাত করায় না, সেহেতু তাদের জন্য 'ভাল' ব্যবস্থা রাখার কোনও দরকারও কেউ বোধ করেনি কখনও। থাকার মধ্যে সরকারি হাসপাতাল, যেখানে গোপনীয়তা শূন্য।

মেডিক্যাল কলেজ যাদের কাছে অনেক দূর, সেই মেয়েদেরও হাতের নাগালে যা রয়েছে, তা হল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। কিন্তু সমস্যা সেই এক,'ভাল' মেয়েরা সেখানে গিয়ে কন্ট্রাসেপটিভ নিয়ে আলোচনা করবে, সে অসম্ভব। কলকাতা ঘেঁষা রাজারহাটের একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিদিমণিরা তো বলেই দিলেন, প্রথম সন্তান হয়ে যাওয়ার পর পিল, আর দু'টো সন্তান হওয়ার পর লাইগেশন, এই কথাই বলতে বলা হয়েছে তাঁদের। এমনকী ১৬-১৭ বছরে বিয়ে-হওয়া মেয়েদেরও গর্ভনিরোধ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার নাকি নিয়ম নেই। স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদের প্রশ্ন করলে অবশ্য তাঁরা এমন কোনও নিয়মের কথা পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। 'রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ'-এর যে নীতি ভারত এখন মেনে চলে, তাতে নিজের শরীর সম্পর্কে জানার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালে বেজিং-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের পঞ্চম আন্তর্জাতিক মহিলা সমাবেশ হয়েছিল, তার প্রস্তাবনাতেও মেয়েদের নিজের শরীর সম্পর্কে জানার অধিকারকে, প্রয়োজনে কনট্রাসেপটিভ, গর্ভপাত পরিষেবা, কাউন্সেলিং পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে ভারত সরকার সই-ও করেছিল। অথচ ভারতেরই রাজ্যগুলো সুবিধেমতো সেই নীতির বিরোধিতা করে, বা খাতায়-কলমে মেনে কাজের বেলায় অবাধে অগ্রাহ্য করে। এ দেশে, এ রাজ্যে, প্রথম সন্তান জন্মের আগে কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার মেয়েদের পক্ষে এখনও বেশ কঠিন।

শেষে একটু ছুঁয়ে দেখা যাক খাদ্যনীতিকে। ভারতে খাদ্যনীতির বরাবর একটাই লক্ষ্য, গরিবের কাছে সস্তায় চাল-গম পৌঁছে দেওয়া। খাদ্যনীতির আলোচনা মানেই দাঁড়িয়েছে রেশন ব্যবস্থার আলোচনা। কিন্তু চাল-গমের বাইরে যে খাবারগুলো সুষম পুষ্টির জন্য প্রয়োজন, তার কী হবে? ডাল, ডিম, সবজি যদি গরিব-নিম্নবিত্তের নাগালের বাইরে থেকে যায়, বরং তা কেনা আরও, আরও কঠিন হয়ে ওঠে ক্রমশ (খাদ্যে মুদ্রাস্ফীতি অন্য পণ্যের চাইতে অনেক দ্রুত বাড়ছে), তা হলে আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্যের ছবিটা কেমন হবে? ২০০৯-১০ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, গ্রামের পরিবারগুলোও তাদের মোট রোজগারের যত অংশ আগে খরচ করত চাল-গমের জন্য, এখন করছে তার চাইতে অনেক কম। এদিকে দুধ, ফল, মাছ-মাংসের জন্য মাসিক খরচও যে আগের চাইতে বাড়ছে, এমনও নয়। আর আগের চাইতে কমছে ডাল খাওয়া। তা হলে কী করে নিশ্চিত করা যাবে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের পুষ্টি? পেটপুরে ভাত খাওয়ালেই কি ওরা ভাল থাকবে?

আমাদের দেশে ৪২ শতাংশ শিশুর ওজন কম। অন্য দিকে বড় শহরগুলোর প্রতি পাঁচটি শিশুর একটির ওজন বেশি। খাদ্যনীতি দ্বিতীয় সমস্যার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ। এর দায় চাপানো হয় পরিবারগুলোর ওপর, তাদের পশ্চিমি খাদ্যাভ্যাসের ওপর। কিন্তু পশ্চিমে রাষ্ট্র যে স্কুলের ক্যান্টিনে হাই-ক্যালরি খাবার নিষিদ্ধ করেছে, ম্যাকডোনাল্ডসের মতো ফুড চেনগুলিতে স্যালাড, ফল রাখা আবশ্যক করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে যে রাখা থাকছে দিনে পাঁচবার সবজি খাওয়ার কথা, সেগুলো আমরা ভুলে যাচ্ছি। আর সর্বোপরি, চটজলদি খাবারের মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাবার থাকে ও দেশে। মাল্টিগ্রেন রুটির স্যান্ডউইচ, ফল-মেশানো দই, প্যাকেজের মধ্যে স্যালাড বা সুপ, এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাওয়ার মধ্যে এগুলো সহজে তুলে নিতে পারে ছেলেমেয়েরা। এখানেও কি স্কুল-কলেজের ক্যান্টিনে পরিকল্পনা করে মুখরোচক কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার রাখা যায় না? সে বিষয়ে কি কর্তৃপক্ষের কোনও দায় নেই? কেবল পরিবারকে দোষ দিলেই হবে?

বিদেশে দেখা যায়, ধনী পরিবারগুলিতে মানুষজন ছিপছিপে। তারা বেশি দাম দিয়ে স্বাস্থ্যকর লো-ক্যালরি খাবার খায়। অনেক টাকা দিয়ে স্পোর্টস ক্লাবে যায়। গরিবরা শস্তার খাবার খায়, কম পয়সায় অনেকটা হাই-ক্যালরি, হাই-ফ্যাট খাবার, তাই স্থূলতা গরিবদের মধ্যেই বেশি। এ দেশেও ব্যবস্থাটা প্রায় তেমনই দাঁড়িয়েছে। হাই-ফাইবার বিস্কুটের দাম সাধারণ বিস্কুটের চারগুণ, নানা শস্য দিয়ে তৈরি 'নিউট্রিবার' খেলে পেট ভরবে না কিন্তু পকেট ফাঁকা হবে। স্যালাড-সহ ফ্রেশ স্যান্ডইউচ খেতে যা টাকা লাগবে, তার চেয়ে মাংস-আলু দেওয়া এক ঢিপি বিরিয়ানি সস্তা। গড়পড়তা ব্র্যান্ডের আইসক্রিমের চাইতে ফ্যাটহীন দইয়ের দাম বেশি। অল্প বয়সী ছেলেমেয়ের কাছে অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প কোথায়?

ভারত খাদ্যনীতি বলতে বুঝেছে খাদ্য নিরাপত্তা, যার মানে দাঁড়িয়েছে খাদ্যের অভাব মেটানো। কিন্তু স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে তা যথেষ্ট নয়। আজকের জীবনযাপনের উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস, উপযুক্ত খাদ্য, এই বিষয়গুলিকেও নীতির মধ্যে আনতে হবে। প্যাকেজড ফুড তৈরি ও বিপনন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন, রেস্তোরাঁ থেকে রাস্তার খাবার, সবই আনতে হবে সেই নীতির মধ্যে। খিদের মুখে হাতের কাছে কী পাবে ছেলেমেয়েরা, তাই নীতি নির্ধারকদের চিন্তার বিষয় হওয়া দরকার।

তা হয়নি, হয় না। তাই বেশি নম্বর-পাওয়া ভাল ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে কোচিং যাওয়ার পথে চটজলদি খেয়ে নেয় এগরোল, পট্যাটো চিপস, প্যাটিস-পেস্ট্রি। এসব খাবারকে 'খারাপ' বলে ভাবতে শেখেনি 'ভাল' মেয়েরা। তাদের মনে আমরা ভাল-মন্দের যে বোধ গড়ে তুলছি, তার মধ্যে স্বাস্থ্যের ভাল-মন্দ আমল পাচ্ছে না, জায়গা পাচ্ছে না। এটাই আমাদের সন্তানদের সংকট। আর আমাদের স্বদেশেরও।

লেখক পরিচিতি : স্বাতী ভট্টাচার্য, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।

অবাঞ্ছিত লোম

এ রোগে শারীরিক কষ্ট নেই, আয়ু হ্রাস নেই, আছে খালি সমাজের তৈরি করা নারীমূর্তির সাথে নিজেকে মিলিয়ে না নেওয়ার উৎপীড়ন— লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস।**

এমন কিছু শারীরিক সমস্যা আছে যার জন্য এটুকু দৈহিক কষ্ট ভোগ করতে হবে না, একদিনও আয়ু কমবে না কিন্তু সমাজ সৃষ্ট কিছু ধারণার জন্যে মানসিক বেদনা এক শূন্যতার অনুভূতির দিকে ঠেলে দেবে— যেমন শ্বেতী, মাথার টাক পড়া, কালো রঙ। ঠিক এই রকমই একটা সমস্যা হল মহিলাদের অবাঞ্ছিত লোম— অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির পরে পুরুষদের শরীরের যে সব জায়গায় মোটা চুলের মতো লোম গজায় সেখানে ওই ধরনের লোম গজানো। ডাক্তারি পরিভাষায় এর নাম হারসুটিজম (Hirsutism) বা মহিলাদের পুরুষালি খর-লোমাধিক্য।

অ্যাড্রিনাল বা ডিম্বাশয়ের কিছু টিউমার থাকলে এই পুরুষোচিত লোমের সঙ্গে অন্যান্য পুরুষোচিত লক্ষণও দেখা যায়। যেমন। গলার স্বর মোটা হয়ে যাওয়া, মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা হওয়া, অতিরিক্ত ব্রণ বেরোনো, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, মাংসপেশি স্ফীত হওয়া, বহিঃজননাঙ্গে কিছু পরিবর্তন যেমন ক্লাইটোরিস (Clitoris) বড় হয়ে যাওয়া।

- **বেশি লোম ও অবাঞ্ছিত লোমের পার্থক্য কি?**

হাত ও পায়ের পাতা বাদে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমস্ত শরীরের ত্বকে মিহি লোম (vellus hair) থাকে যা স্বাভাবিক। বয়ঃসন্ধির পরে পুরুষদের শরীরে জননাঙ্গ ও বগল ছাড়াও অন্য কিছু অঞ্চলে চুলের মতো মোটা এক ধরনের লোম গজায় তাকে খরলোম (Terminal Hair) বলে। এই খরলোম গজানোর ব্যাপারটা পুরোপুরি অ্যান্ড্রোজেন নামে একটা হরমোনের দ্বারা প্রভাবিত। কোনও কোনও মহিলার বংশগত বা জন্মগত ভাবেই সমস্ত শরীরে মিহি লোম বেশি থাকে— এই ব্যাপারটা স্বাভাবিক এবং অবাঞ্ছিত পুরুষালি লোমের সমস্যার সঙ্গে কখনওই এই মিহি লোমাধিক্য (Hypertrichosis) কে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। মিহি লোমাধিক্যের জন্য কোনও দুশ্চিন্তা বা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই, তাতে লাভও নেই।

- **মহিলাদের অবাঞ্ছিত পুরুষোচিত লোমের লক্ষণ কী?**

প্রথমত : শরীরের বিশেষ কিছু স্থানই পুরুষোচিত লোমের জন্য নির্ধারিত, কারণ এই অঞ্চলের লোম নির্ভর করে শরীরের অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের মাত্রার ওপর। এই জায়গাগুলো হল— গোঁফের অঞ্চল, দাড়ির অঞ্চল, বুকের মধ্যভাগ, পেটের মধ্যরেখা, স্তনবৃন্তের পাশের বৃত্তাকার জায়গা, পিঠের নীচের দিক ও পশ্চাৎদেশ, উরুর ভেতরের দিক।

দ্বিতীয়ত : এই লোমের গঠন শরীরের সাধারণ লোমের চাইতে অন্যরকম, একটু মোটা ধরনের।

অ্যাড্রিনাল বা ডিম্বাশয়ের কিছু টিউমার থাকলে এই পুরুষোচিত লোমের সঙ্গে অন্যান্য পুরুষোচিত লক্ষণও দেখা যায়। যেমন। গলার স্বর মোটা হয়ে যাওয়া, মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা হওয়া, অতিরিক্ত ব্রণ বেরোনো, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, মাংসপেশি স্ফীত হওয়া, বহিঃজননাঙ্গে কিছু পরিবর্তন যেমন ক্লাইটোরিস (Clitoris) বড় হয়ে যাওয়া। এই সব পুরুষোচিত লক্ষণকে মিলিতভাবে ডাক্তারি পরিভাষায় ভিরিলাইজেশন (Virilization) বলে।

- **মহিলাদের পুরুষোচিত লোমের কারণ নির্ণয় করা হয় কি ভাবে?**

কিছু পরীক্ষা করা দরকার, কেননা পুরুষোচিত লোমের কারণ জানা আবশ্যিক। কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা করানোটাও জরুরী।

১। রক্তে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা নির্ণয় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই হরমোনের মাত্রা যদি ২০০ ন্যানোগ্রাম / মিলি-র কম থাকে তা হলে বুঝতে হবে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বা ডিম্বাশয়ে টিউমারের মতো গুরুতর সমস্যা নেই। আর যদি ২০০ ন্যাগ্রা / মিলি এর বেশি হয় তা হলে আরও কিছু পরীক্ষা দ্বারা টিউমার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে এবং সেটি কোথায় ও কী প্রকারের সেটা বুঝে নিতে হবে। তলপেটের আলট্রাসোনোগ্রাফিতে ডিম্বাশয়ের টিউমার ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির টিউমার ধরা পড়ে।

রক্তে ডিহাইড্রোএপিঅ্যানড্রোস্টেরন (DHEA) নামে একটা হরমোনের মাত্রাও কিছুটা দিক-নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে। যদিও পলিসিস্টিক ওভারির সমস্যাতেও এই হরমোন কিছু বেশি দেখা যায়, এই হরমোন শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি নিঃসৃত হয় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে। তাই DHEA-র মাত্রা বেশি হলে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির টিউমারের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হয়।

পলিসিস্টিক ওভারি-র সমস্যা বর্তমানে মহিলাদের পুরুষোচিত লোমের একটা বড় কারণ।

তলপেটের আলট্রাসোনোগ্রাফি ও অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের মাত্রা দেখে রোগ ধরা যায়।

জন্মগত অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির স্ফীতিও পুরুষোচিত লোমের কারণ। রক্তে ১৭-হাইড্রোক্সি প্রজেস্টেরোনের মাত্রা বেশি হলে এটা ভাবা হয়। প্রোল্যাকটিন নামে একটি হরমোন বেশি নিঃসৃত হলেও এই ধরনের লোম দেখা যায়। প্রোল্যাকটিন হরমোন বেশি হওয়ার কারণে যদি লোম বাড়ে, তা হলে সঙ্গে অনিয়মিত ঋতুস্রাব, অবাঞ্ছিত দুগ্ধনিঃসরণ এই সব সমস্যাও থাকে।

কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবেও হারসুটিজম (Hirsutism) দেখা যায়। যেমন মিনক্সিডিল, ফেনিটইন, সাইক্লোস্পোরিন, অ্যাসিটোজোলামাইড, দীর্ঘদিন চলা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ।

কুশিং সিনড্রোম নামে একটি অসুখে দেহের মধ্যভাগ স্থূল হয়ে যাওয়া, চামড়ায় ফাটা দাগ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে এই ধরনের লোমাধিক্যও দেখা যায়।

অবাঞ্ছিত লোমের জন্য বিব্রত হওয়া থেকে বাঁচার উপায়?

এ ব্যাপারে প্রথম পরামর্শ হল, ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে, প্রয়োজন হলে কিছু পরীক্ষা করে, কারণটা জেনে নেওয়া। গুরুতর সমস্যা কিছু থাকলে রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হারসুটিজম-এ লোম দূর করা ছাড়া আর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। একটা কথা মনে রাখা জরুরি। ঋতুচক্রের সমস্যা না থাকলে, শারীরিক পরীক্ষায় কোনও অস্বাভাবিকত্ব না ধরা পড়লে, এবং অবাঞ্ছিত লোম খুব বেশি রকম না হলে, বিভিন্ন পরীক্ষা- নিরীক্ষার সাধারণত দরকার নেই। বিশেষ করে পরিবারে মহিলাদের বেশি লোমের ইতিহাস থাকলে, বা জনগোষ্ঠীতেই যদি মহিলাদের বেশি লোম থাকে, তা হলে একথা বেশি করে সত্য। নারীদের ঋতুচক্র স্থায়ী ভাবে বন্ধ হবার পরও কিছু লোম বাড়তে পারে— এটাও স্বাভাবিক।

এ ব্যাপারে প্রথম পরামর্শ হল, ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে, প্রয়োজন হলে কিছু পরীক্ষা করে, কারণটা জেনে নেওয়া। গুরুতর সমস্যা কিছু থাকলে রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হারসুটিজম-এ লোম দূর করা ছাড়া আর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। একটা কথা মনে রাখা জরুরি। ঋতুচক্রের সমস্যা না থাকলে, শারীরিক পরীক্ষায় কোনও অস্বাভাবিকত্ব না ধরা পড়লে, এবং অবাঞ্ছিত লোম খুব বেশি রকম না হলে, বিভিন্ন পরীক্ষা- নিরীক্ষার সাধারণত দরকার নেই।

পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের (PCOS) ৭০-৮০ ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে— সেই কারণে হারসুটিজম হয়। অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের মাত্রা বংশগত কারণেও বেশি হয়। পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের ক্ষেত্রে সব কিছু একদম নিয়মানুক্রমে হওয়া উচিত— ঠিক সময়ে ঘুমোনো, স্ট্রেস কমানো, অতিরিক্ত ক্যালরিযুক্ত খাবার না খাওয়া ইত্যাদি। অতিরিক্ত মাত্রার PCOS থাকলে ওষুধ দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। তবে ওজন বেশি থাকলে সেটা কমানো খুব জরুরি। এফ্লোরনিথিন নামক মলম যাতে লোমের বৃদ্ধি কমে এটাও চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

কসমেটিক বা প্রসাধন জাতীয় জিনিস দিয়ে লোম তোলার বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। যেমন কামানো (শেভিং), মোম দিয়ে তোলা (ওয়াক্সিং), কেমিক্যাল লাগিয়ে লোম গলিয়ে ফেলা। এ ছাড়া চিকিৎসকেরা ইলেকট্রোলিসিস ও লেজার দ্বারা লোম নষ্ট করে ফেলেন। রোগীর লোমের মাত্রা, আর্থিক সামর্থ্য ইত্যাদি বিবেচনা করে কোন পদ্ধতিতে লোম তোলা হবে তা নির্বাচন করা হয়। বেশি খরচসাপেক্ষ পদ্ধতি মানেই সেটা ভাল, তা কিন্তু নয়।

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ডিভিডি, একটি সরকারি হাসপাতালে চর্মরোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

ভেজাল খাদ্য— ভয়ঙ্কর

ভেজাল ছাড়া খাদ্য বাঙালি বোধহয় এখন স্বপ্নেও খেতে পারে না। চালে কাঁকর, আটায় ভূষি, দুধে জল— এ সব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নিত্য নতুন ভেজাল আবিষ্কারের যুগ। তারই কিছুটা আভাস দিচ্ছেন **মানসরঞ্জন মাইতি**।

ভেজাল কী?

দু'টো উদাহরণ দিলে বোধহয় সহজভাবে বোঝা যাবে।

১। পাঁচু পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় বাবার বকুনি খেয়ে, বন্ধুর বাবার দোকান থেকে কীটনাশক এনে খায়। বাড়ীর লোক জানতে পেরে পাঁচুকে হাসপাতালে ভর্তি করে। সবাই ভেবেছিল পাঁচুকে আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু দিন ছয়েকের মধ্যে পাঁচু সুস্থ হয়ে ওঠে। হঠাৎ পাঁচুর বন্ধুর বাবা পাঁচুর বাবাকে বললেন ভাগ্যিস কীটনাশকে ভেজাল দিয়েছিলাম, তাই তোর ছেলেটা বেঁচে গেল।

২। গত বছর জুন মাসে দিদির ছেলের মুখেভাতে পুরুলিয়ার এক গ্রামে গিয়েছিলাম। দিদির বাড়িতে কয়লার উনুন। কয়লার উনুন ধরানোর জন্য ঘুঁটের দরকার হয়। দিদি গিয়ে উনুনের নীচে ঘুঁটে দিয়ে, কেরোসিন ছড়িয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলেন কেরোসিনটা জ্বলে গেল কিন্তু ঘুঁটে আর জ্বলে না। দিদি ঘুঁটে দেওয়ার মাসিকে ডেকে ব্যাপারটা বললেন। মাসি বলল, বাবা, ঘুঁটে জ্বলবে কী করে? জলের অভাবে মাঠে ঘাস কম, গরু ঘাসের সঙ্গে মাটি বেশি খেয়েছে। তাই ঘুঁটেতে মাটির ভেজাল বেশি।

ভেজাল কেন?

এ বড় কঠিন প্রশ্ন। পুরো উত্তরটা এখানে দেওয়ার চেষ্টা না করে, শুধু ট্র্যাডিশনাল যে ভেজাল তার মূল কারণ এখানে বলছি। তবে বড় বড়

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি খাদ্যাখাদ্যের সংজ্ঞাই বদলে দিচ্ছে—খারাপ জিনিসকে ভাল বলে প্রমাণ করছে। সে ভেজাল অন্য রকম, সে নিয়ে অনেকেই হয়তো লিখছেন। ট্র্যাডিশনাল ভেজালের মূল কারণ হল অসাধু উপায়ে মুনাফা বাড়ানো। তাই লাভের অঙ্ক যত বেশি রাখার চেষ্টা করা হবে, ভেজালের পরিমাণ তত বাড়বে। আবার, নামি কোম্পানির জিনিসের গুণগত মানের সঙ্গে যখন অন্য কোম্পানির গুণগত মান সমান থাকে না, তখন তাদের মধ্যে কিছু অসাধু সস্তায় বাজার মাত করতে চায়। সস্তায় জিনিস দিতে গেলে তেমনই মালপত্র দিয়ে জিনিস তৈরি করতে হবে যাতে লাভ রাখা যায়; অর্থাৎ সোজা কথায় ভেজাল দিতে হবে। এ ছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন এবং জোগান কম হওয়ার জন্য ভেজালের প্রবণতা দেখা যায়। মোটের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলস্বরূপ অবিরত ভেজাল মেশানোর প্রবণতা বাড়ে।

ভেজালের বিপদ ও ভেজাল নির্ণয় পরীক্ষা:

সাদা চোখে ওপর থেকে দেখে তো আর সব ভেজাল ধরা সম্ভব নয়। বিপদ ঘটলে বা পরীক্ষা করলে তবে কোনটা ভেজাল আর কোনটা ভাল তা বোঝা যায়। কয়েকটা খাদ্য / পানীয় দ্রব্যে প্রচলিত ভেজালে ব্যবহৃত বস্তু, তার বিপদও ভেজালের পরীক্ষা দেওয়া হল।

খাদ্য / পানীয়

	খাদ্য/পানীয়	ভেজালে ব্যবহৃত বস্তু	বিপদ	সাধারণ পরীক্ষা
১।	গুঁড়ো চা	● লোহার গুঁড়ো ● রঙ (কোল-টার ডাই) ● চামড়া	● অন্ননালীর ক্ষতি হতে পারে ● ক্যানসার ও অন্যান্য রোগ হতে পারে।	● একটা কাগজের উপর এক চামচ চায়ের পাতা ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর চুম্বক ধরলে লোহাচূর্ণকে আলাদা করে দেবে। এ ভাবে বোঝা যাবে চায়ের মধ্যে লোহাচূর্ণ মেশানো আছে।
২।	দুধ	● জল ● স্টার্চ ● ডিটারজেন্ট ● ননী তুলে নেওয়া	● মিশ্রিত জলে কোনও জীবাণু থাকলে উদরাময়, আমাশয় ও টাইফয়েড হয়। ● অপুষ্টিকর দুধ।	● ল্যাকটোমিটারে রিডিং নীচে চলে এলে বুঝতে হবে, দুধে জল মেশানো আছে। ● পালিশ করার পাথরের ওপর এক ফোঁটা দুধ ফেললে যদি দুধের ফোঁটা ওই খানেই স্থির থাকে বা সামান্য গড়ায়, তবে দুধে জলের ভেজাল কম বা আদৌ নেই। আর দুধ সহজে গড়িয়ে গেলে বুঝতে হবে জলের পরিমাণ বেশি।

	খাদ্য/পানীয়	ভেজালে ব্যবহৃত বস্তু	বিপদ	সাধারণ পরীক্ষা
				● কয়েক ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ একটি টেস্ট টিউবে নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা দুধ দিলে যদি নীল রং হয়ে যায়, তবে দুধে স্টার্চ আছে বুঝতে হবে। ● ১০-১৫ মিলিলিটার দুধের সঙ্গে সমপরিমাণ জল নিয়ে ঝাঁকালে ফেনা হলে বুঝতে হবে দুধে ডিটারজেন্ট মেশানো আছে।
৩।	চিনি	● চকের গুঁড়ো ● ইউরিয়া	● অন্ননালীর ক্ষতি ● অ্যালার্জি	● ১০ গ্রামের মতো চিনি গ্লাসে নিয়ে তার মধ্যে জল মিশিয়ে কিছুটা সময় রেখে দিলে চকের গুঁড়ো গ্লাসের নীচে পড়ে যায় এবং একটি স্তরের সৃষ্টি হয়। ● চিনি জলে গোলার পরেই অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়।
৪।	মিষ্টান্ন, আইসক্রিম, চা, কফি	● মেটানিল ইয়েলো (গ্রহণযোগ্য নয় এমন রং)	● ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।	● ঈষৎ উষ্ণ জলে দিয়ে ঝাঁকিয়ে রঙিন অংশটা পৃথক করে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে যদি উজ্জ্বল লাল বর্ণ দেখায়, তা হলে সেখানে মেটানিল ইয়েলো-র উপস্থিতি বোঝা যায়। ● কিছু পরিমাণ খাদ্য নিয়ে মুখে দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মিষ্টভাব থাকলে বুঝতে হবে স্যাকারিন আছে।
৫।	হলুদ গুঁড়ো	● রং করা (মেটানিল ইয়েলো), কাঠের গুঁড়ো	● অন্ননালীর ক্ষতি, এমনকি ক্যানসার হতে পারে	● চা চামচের এক চামচ হলুদগুঁড়ো টেস্টটিউবে নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে যদি গোলাপি রং হয় এবং আবার আরও জল মেশালে যদি সেই গোলাপি রং না থাকে, তা হলে সেটি আসল হলুদ গুঁড়ো। যদি রং থেকে যায় তা হলে মেটানিল ইয়েলো মেশানো আছে।
৬।	কাঁচা লঙ্কা, সবজি	● ম্যালাকাইট গ্রিন (রং) বা তুঁতে (কপার সালফেট)	● অন্ননালী প্রদাহ	● গরম করে মোম গলিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে সবজির উপরে ঘষতে থাকুন। তুলোর রং সবুজ হয়ে গেলে ম্যালাকাইট গ্রিন বা তুঁতের উপস্থিতি বোঝা যায়।
৭।	সরিষার তেল	● অন্য নিম্নমানের ভোজ্য তেল মেশানো মেশানো, যেমন- রেপসিড তেল। অভোজ্য তেল মেশানো, যেমন- শিয়ালকাঁটার তেল, রেড়ির তেল। ● রাসায়নিক পদার্থ যা সাধারণত ভোজ্য তেলকে বর্ণে ও গন্ধে আকর্ষণীয় করে তোলে।	● এনডেমিক ড্রপসি (শিয়ালকাঁটার তেল)। ● কার্ডিয়োমায়োপ্যাথি ● গ্লকোমা ● সিসা ভেজালে পেটে রোগ এবং স্নায়বিক গোলমাল হতে পারে।	● সরষের তেলে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে অ্যাসিড স্তরে লাল রঙ হলে ওই তেলে শিয়ালকাঁটার তেলের উপস্থিতি বোঝা যায়। ● অন্য ভেজাল ধরা তুলনায় কঠিন, কিন্তু সম্ভব।
৮।	রাবড়ি	● ব্লটিং পেপার	● পেটের রোগ	● রাবড়ির কিছুটা পাত্রে নিয়ে তাতে ২০ মিলিলিটার মিউটিক অ্যাসিড (এক ভাগ জল ও এক ভাগ অ্যাসিড এই অনুপাতে) মিশিয়ে একটা সরু তারের দণ্ড দিয়ে নাড়লে যদি ব্লটিং পেপার থাকে তা হলে অ্যাসিডে গলবে না। বরং ব্লটিং পেপারের ওপরে রোঁয়ার মতো তন্তু দেখা যাবে।

খাবারের রং - হরেক বিপদ

কোনও মেয়ের ঠোঁটে যদি লিপস্টিক লাগানো থাকে, তবে হয়তো তাকে বেশ আকর্ষণীয় লাগতে পারে; কিন্তু লিপস্টিক যদি কোনও চায়ের কাপে লেগে থাকে তা হলে কিন্তু ওই মেয়েটির কোনও গুণগ্রাহীও ওই চায়ের কাপে চা খেতে চাইবে না। তাই যদি হয়, তা হলে কোনও খাবারে রং দেওয়া থাকলে আমরা কেন তা বর্জন করব না, বা জানব না যে খাবারের রঙের বিপদ কী? বিপদগুলো একটু জেনে নেওয়া যাক—

	রং	পোশাকি নাম	ক্ষতি বা বিপদ
১।	ইয়েলো-৬	সানসেট ইয়েলো	সহনসীমার বেশি হলে খাদ্যনালী ও ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি এমনকী ক্যানসার হতে পারে।
২।	ইয়েলো-৫	টারট্রাজিন	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রবল ক্ষতি।
৩।	রেড-৪০	অ্যালিউরা রেড	খেলে বা শ্বাসনালীর মাধ্যমে শরীরে ঢুকলে ক্যানসারের জন্ম দিতে পারে।
৪।	রেড-৩	এরিথ্রোসিন-বি	এর বিপাকজাত পদার্থ ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।
৫।	অরেঞ্জ-বি	স্যাফ্রন	প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি ও পিত্তনালীতে কুপ্রভাব।
৭।	গ্রিন-৩	ফাস্ট গ্রিন	ত্বক, চোখ ও শ্বাসনালীর ক্ষতি।
৮।	ব্লু -২	ইন্ডিগো কার্মাইন	ত্বক, চোখ ও শ্বাসনালীর ক্ষতি।
৯।	ব্লু -১	ব্রিলিয়ান্ট ব্লু	কিডনির সমস্যা। গর্ভস্থ শিশু বা ৬ বছরের কমবয়সী শিশুদের স্নায়বিক রোগ।

সূত্র : ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি ইন্ডিয়া-র ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল।

ঠান্ডা পানীয় : নামকরা ঠান্ডা পানীয়তে অত্যধিক মাত্রায় কীটনাশকের উপস্থিতির ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। তা নিয়ে হয়তো নানা জনের স্বার্থে নানা রকম কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের শরীর ও পরিবেশের ক্ষতি যে হচ্ছে, সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

আইনের গুরুত্ব : খাদ্যে ভেজাল দেওয়া একটি সামাজিক অপরাধ। গ্রাহকদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ আইন (Prevention of Food Adulteration Act) ''PFAA'' চালু করেন। এই আইন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতাদের ভেজাল দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করায় সাহায্য করছে। এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগার কলকাতায় রয়েছে। রাজ্য সরকারের অধীন খাদ্য পরিদর্শকেরা বিভিন্ন সময়ে সন্দেহজনক খাদ্যবস্তুর নমুনা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের খাদ্য পরীক্ষাগারে খাদ্যবস্তুর গুণমান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য পাঠান।

PFAA অনুযায়ী কোনও খাদ্য বস্তুকে ভেজাল বলে মনে করা যেতে পারে যদি—

- কোনও খাদ্যবস্তু স্বাভাবিক প্রকৃতির না হয়;
- অন্য কোনও নিম্নমানের অথচ সস্তার জিনিস আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে সংশ্লিষ্ট মূল বস্তুর স্থান দখল করে;
- খাদ্য বস্তুর বিশেষ উপাদান আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বের করে নেওয়া হয়;
- অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় প্রস্তুত বা প্যাকেটজাত করা হয়;
- সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পচা / দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য হয়;
- খাদ্যবস্তু রোগাক্রান্ত প্রাণী থেকে সংগ্রহ করা হয়;
- খাদ্যে কোনও বিষাক্ত বস্তুর উপস্থিতি থাকে;
- খাদ্যে রঙের ব্যবহার অপরিমিত ভাবে করা এবং / অথবা অননুমোদিত রং ব্যবহার করা হয়।

করণীয় কী?

সব সময় তো আর প্রতিটা খাদ্যদ্রব্য রীতিমতো পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই ভেজাল এড়ানোর জন্য এই সাধারণ পদ্ধতিগুলো মেনে চলুন—

- কোনও খাদ্য বাজারদরের অপেক্ষায় সস্তায় বিক্রি হচ্ছে দেখলে সাবধান হোন।
- গুঁড়ো মশলা না কিনে আস্ত মশলা বাড়িতে গুঁড়ো করে নিন।
- আকর্ষণীয় রঙের সবজি বা মশলা না কেনাই ভালো।
- প্যাকেজ করা খাদ্য খোলা অবস্থায় কিনবেন না।
- লেবেল দেখে আসল প্যাকেটটি কিনুন।
- কোনও খাদ্যে ভেজাল সন্দেহ হলে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ বা খাদ্য পরিদর্শককে খবর দিন।

লেখক পরিচিতি : মানসরঞ্জন মাইতি, এমএসসি, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

মনোরোগের চিকিৎসায় কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি

উনিশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত মানসিক রোগ ও তার বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে মানুষের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। যে সব রোগীর মানসিক অবস্থার খুব অবনতি হত, তাদের সচরাচর মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হত বা অন্যান্য প্রথাগত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত। আর চূড়ান্ত মানসিক রোগগ্রস্ত না হলে মানসিক রোগীর সে রকমভাবে কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত না। কিন্তু আজ মনোরোগের চিকিৎসা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে— লিখছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

সিগ্‌মাণ্ড ফ্রয়েড প্রথম সাইকোথেরাপির ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। তাঁর মতে যে কোনও মানুষের বর্তমান মানসিক দুর্বলতার কারণ লুকিয়ে থাকে তার শৈশবের অভিজ্ঞতার মধ্যে, যা অনেক ক্ষেত্রেই তার অবচেতন স্তরে থেকে বর্তমান সমস্যার নির্ধারক হিসাবে কাজ করে। দীর্ঘকালীন চিকিৎসার মাধ্যমে সেই মূল কারণকে রোগীর সচেতন স্তরে এনে রোগের উপসর্গ কমাতে সক্ষম হলেন তিনি। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসাকে 'সাইকো অ্যানালাইসিস' আখ্যা দেওয়া হল।

পরবর্তী সময়ে মনোবিদরা আলাদা আলাদা তত্ত্বের ভিত্তিতে সাইকোথেরাপির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন। মানসিক চিকিৎসা মানেই 'ইলেকট্রিক শক্'— এই ভয়ংকর চিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি পেল। উন্মাদ অবস্থা না হয়ে সামান্য মানসিক সমস্যায় মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেতে লাগল। যদিও আমাদের ভারতের মতো বিকাশশীল দেশে আজও মানসিক রোগ সম্বন্ধে অনেক একপেশে ধারণা, অনেক কুসংস্কার মানুষের মনে জড়িয়ে আছে, তবু এখন মানুষ আগের থেকে অনেক সচেতন হয়েছেন। মানসিক রোগ সম্বন্ধে বেশি সচেতন হওয়ার দরকারও আছে। সভ্যতার সংকটে আজ যে মানসিক চাপ ও তার কুফল প্রকট হয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্য ডাক্তার, মনোবিদ্, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ্‌দের একসঙ্গে মিলে কাজ করার দরকার আছে। এখানে সাইকোথেরাপি ও কাউন্সেলিং সম্বন্ধে বিশদে লেখা হচ্ছে।

'সাইকোথেরাপি' ও 'কাউন্সেলিং' শব্দ দুটি অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। 'কাউন্সেলিং বলতে প্রধানত পরামর্শ দেওয়া বোঝায়। পরামর্শদান বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন— অর্থনৈতিক বিষয়ে পরামর্শদান বা শিক্ষার ব্যাপারে পরামর্শদান— এ সবই কাউন্সেলিং। ঠিক সে রকম মানসিক সমস্যার ব্যাপারে পরামর্শদানকেও কাউন্সেলিং বলা হয়। কাউন্সেলিং-এ একটা বিশেষ উপসর্গ বা সমস্যামূলক পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে কী করে সেই বিশেষ পরিস্থিতির সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া

হয়।

অপর পক্ষে, সাইকোথেরাপিতে বিশেষ সমস্যার সমাধান সরাসরি না করে ব্যক্তির শারীরিক ও ইমোশনাল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। সার্বিকভাবে পৃথিবীর সঙ্গে তার মোকাবিলা করার জন্য চিন্তাভাবনা ও ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। সেজন্য সাইকোথেরাপি কাউন্সেলিং-এর তুলনায় সময়সাপেক্ষ চিকিৎসা।

তবে, বাহ্যিক বিশ্বের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমস্যা দেখা দিলে, কারণ বিচার করতে গিয়ে সাধারণত দেখা যায় অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা ব্যক্তিত্বজনিত সমস্যা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সে সব ক্ষেত্রে দক্ষ মনোবিদরা পরিস্থিতি অনুযায়ী দুয়েরই ব্যবহার করতে পারেন।

ইদানিং সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে কোনও এক বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষজ্ঞরা একটা সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করারই পক্ষপাতী। সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং-এ ঠিক কীভাবে সমস্যা সমাধান করা হয়, সে সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের তত্ত্বগত দিকটা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাইকো অ্যানালাইসিস : ফ্রয়েড বললেন আমাদের ব্যক্তিত্বের গঠন ও আমাদের আচরণ বেশির ভাগটাই নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের অবচেতন মনের দ্বারা। তাই অবচেতন মন বিশ্লেষণ করে কারণগুলোকে যদি চেতন-স্তরে আনা যায় তা হলে মানসিক সমস্যা (রোগ) সেরে যাওয়া সম্ভব। এই ভাবে তিনি হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা করে সফল হলেন। এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও অত্যন্ত খরচসাপেক্ষও বটে। স্বপ্ন বিশ্লেষণ, ফ্রি-অ্যাসোসিয়েসন (Free association) এগুলি সাইকো অ্যানালাইসিসের বিভিন্ন টেক্‌নিক।

পার্সন-সেন্টারড থেরাপি (Person-centred Therapy) : মনোবিদ্ কার্ল রোজার্স এক নতুন পদ্ধতি চালু করলেন। তত্ত্বের দিক থেকে তিনি বললেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই স্বভাবগতভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন (Positive direction) আনা সম্ভব। তার জন্য থেরাপিস্টের মধ্যে কয়েকটা শর্ত (condition) থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সহমর্মিতা (empathy), নিঃশর্ত শ্রদ্ধা (unconditional love and positive regard) ও নিজের মধ্যে সমতা (balance)— এই গুণগুলি থাকলে থেরাপিস্ট যে কোনও ব্যক্তিকে মানসিক সমস্যা থেকে মুক্ত করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

র‍্যাশনাল্ ইমোটিভ বিহেভিয়র থেরাপি

(Rational Emotive Behavior Therapy) (সংক্ষেপে REBT) : ১৯৬১ সালে অ্যালবার্ট এলিস এক নতুন তত্ত্বের ভিত্তিতে, নতুন পদ্ধতিতে মানুষের প্রক্ষোভজনিত সমস্যার (emotional problem) সমাধান করতে থাকেন। তিনি বলেন, আমাদের নেতিবাচক বা নেগেটিভ ইমোশনগুলো অর্থাৎ রাগ, দুঃখ, উদ্বেগ ইত্যাদি যখন মাত্রারিক্ত হয়ে ওঠে তখন তার কারণ হিসাবে বাহ্যিক ঘটনা সম্পূর্ণ দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী মূলত আমাদের অযৌক্তিক বিশ্বাস। এলিস্ তিন ধরনের অযৌক্তিক বিশ্বাসের কথা বলেছেন— (১) নিজের ওপর অতিরিক্ত চাহিদা (যেমন - আমায় সব সময়ে সফল হতেই হবে) (২) অন্যের কাছ থেকে অতিরিক্ত চাহিদা (যেমন - সে আমায় এমন কথা বলবে কেন?) (৩) জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর অতিরিক্ত চাহিদা (যেমন - আমার জীবনেই কেন এমন ঘটলো?)। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসগুলো থেকে আমাদের কখনও কখনও মনে হয় 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না' বা 'পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে' আর তখনই মাত্রারিক্ত নেতিবাচক প্রক্ষোভ (নেগেটিভ ইমোশন) আমাদের কাবু করে ফেলে। এলিস বলেছেন বারবার অভ্যাস করে যদি আমরা যুক্তি দিয়ে এই অযৌক্তিক বিশ্বাসগুলোকে খণ্ডন করতে পারি, তা হলে আমরা নিজেরাই পারিপার্শ্বিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম হব এবং মানসিক অবসাদ এড়াতে পারব। এই যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার পদ্ধতি (disputing) শিখতে দক্ষ মনোবিদের সাহায্য দরকার।

কগ্‌নিটিভ থেরাপি : মনোবিদ অ্যারন বেক অবসাদের চিকিৎসায় এক নতুন তত্ত্বের সন্ধান দিলেন। তিনি বললেন, আমাদের নেতিবাচক প্রক্ষোভ (negative emotion) আসলে কতকগুলো নেতিবাচক চিন্তার (negative thinking)-এর ফল। প্রায় দশটার মতো ভুল চিন্তা (automatic negative thoughts) খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানসিক সমস্যায় কাজ করে চলে। যেমন—আমরা অনেক সময় ভাবি 'আমার দ্বারা কিছু হবে না।' এই চিন্তা অমূলক, কারণ কোনও এক বিষয়ে সফল হতে না পারলেই সব বিষয়েই আমি অসফল হব এমন প্রমাণ কোথাও নেই। এই ধরনের অমূলক চিন্তাগুলোকে চিনে তা যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করে যথার্থ চিন্তা দিয়ে সেগুলোকে প্রতিস্থাপিত করতে পারলে মানসিক সমস্যা মুক্ত হওয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে অভ্যাস করতে হলে দক্ষ মনোবিদের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক।

বিহেভিয়র থেরাপি (Behavior Therapy) : বি.এফ.স্কিনার ও পাভলভ-এর শিখনের (learning) তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে আচরণগত সমস্যা নির্মূল করার জন্য সাইকোথেরাপির বিভিন্ন পদ্ধতি চালু আছে। সেগুলো মূলত পুরস্কার ও শাস্তিমূলক পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তত্ত্বগত ভাবে বলা হয় ব্যক্তির কোন্ আচরণটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তা নির্ভর করে সেই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তার অভিজ্ঞতা সুখকর (rewarding) না দুঃখজনক

(punishing) তার ওপর। বিভিন্ন 'reinforcing schedule' ব্যবহার করে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ।

এই সমস্ত পদ্ধতি ছাড়াও আরও অনেক পদ্ধতি আছে যা মনোবিদরা পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকেন। ড্রাগ থেরাপির সঙ্গে সঙ্গে সাইকোথেরাপি ও কাউন্সেলিং দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করলে দীর্ঘস্থায়ী উপকার পাওয়া যায়।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ্, শ্রমজীবী মানুষের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যুক্ত ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

স্মরণে

ডা. জোসেফ এডওয়ার্ড মারে

ডা. জয়ন্ত দাস

উনষাট বছর আগে, বস্টনে এক কনকনে ডিসেম্বরে পঁয়ত্রিশ বছরের এক শল্যবিদ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ধরে অপারেশন করছিলেন। রিচার্ড হ্যারিকের ভাগ্য খারাপ, কিডনির অসুখে তাঁর বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। আবার তাঁর ভাগ্য আর পাঁচজনের চাইতে ভালই বলতে হবে, কেননা তাঁর এক যমজ ভাই ছিলেন, রোনাল্ড হ্যারিক। শুধু যমজ নয়, যাকে বলে হুবহু সদৃশ যমজ, আইডেন্টিক্যাল টুইন মা-বাবা আলাদা করে চেনার জন্যে ছোটবেলায় দু'জনকে দু'রকম রং-এর জামা কিনে দিতেন। রোনাল্ড আর রিচার্ডকে একই সঙ্গে অপারেশন টেবিলে তোলা হল, প্রথমে রোনাল্ডের সুস্থ দু'টো কিডনির মধ্যে একটাকে কেটে নেওয়া হল, তারপর রিচার্ডের পেট কেটে রোনাল্ডের সেই কিডনিটা বসিয়ে দিলেন ডা. মারে।

ডা. জোসেফ এডওয়ার্ড মারে। অপারেশনের অনেক পরে ১৯৯৯ সালে যখন তিনি কিংবদন্তিপ্রতিম ও নোবেল প্রাইজ-পাওয়া এক সেলেব্রিটি, তখন এই অপারেশন সম্পর্কে বলেছিলেন, ''হ্যাঁ, আমি অপারেশন করার সময়ে জানতাম, ব্যাপারটা বিরাট বড় মাপের বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমি সেটাকে ওই সময়ে রোজকার আর পাঁচটা কাজের মতো করেই করেছিলাম। কেননা রোগীর কাছে যে কোনও অপারেশনই বিরাট বড় মাপের ব্যাপার।'' অর্থাৎ, ডাক্তারের নিজের কেরিয়ারের জন্য বিশেষ রোগীকে বিশেষ যত্ন নেওয়া, তা তিনি একেবারেই মানতে পারতেন না। যত্ন তো সব রোগীরই প্রাপ্য।

> যত্ন তো সব রোগীরই প্রাপ্য। মানুষ কি কেবল তার গিনিপিগ-মূল্যে মূল্যবান হতে পারে?

মানুষ কি কেবল তার গিনিপিগ-মূল্যে মূল্যবান হতে পারে?

তবু সত্যিই কি আর ওই অপারেশন 'আর পাঁচটা রোজকার কাজের মতো' হতে পারে? না। অপারেশনের আগের দিন রাত্রে ডা. জোসেফ মারে তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেছিলেন। অপারেশনটা ঠিকঠাক না হলে যে অজস্র মানুষ নিজের মৃত্যুর দিন গুনছেন, তাঁদের জন্য কিচ্ছু করা যাবে না। ২০০১ সালে লেখা আত্মজীবনী 'সার্জারি অফ দ্য সোল'-এ লিখেছেন ডা. মারে----''... যখন দান করা

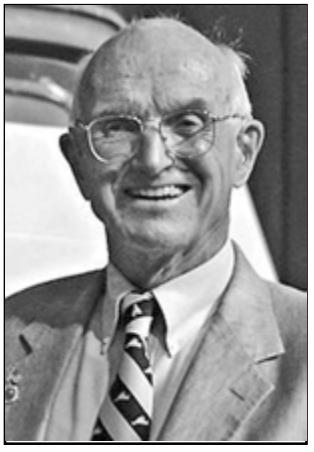

জোসেফ এডওয়ার্ড মারে, জন্ম ১ এপ্রিল ১৯১৯, মৃত্যু ১৬ নভেম্বর ২০১২

(রোনাল্ডের) কিডনিটার গায়ে সেলাই করে লাগানো (রিচার্ডের) শিরা ও ধমনী থেকে সার্জিক্যাল ক্ল্যাম্পগুলো খুলে নিচ্ছি, গোটা অপারেশন থিয়েটারে তখন রুদ্ধশ্বাস নৈঃশব্দ্য। কিডনির মধ্যে দিয়ে (রিচার্ডের) রক্ত চলতে শুরু করল, আস্তে আস্তে রক্তে ফুলে রাঙা হয়ে উঠল সেটি। সবার মুখে তখন একচিলতে বিজয়ীর হাসি।"

নতুন জীবন পাওয়া রিচার্ড হ্যারিক এক নার্সকে বিয়ে করেছিলেন। দুই সন্তান ছিল তাঁদের। 'পাওনার অতিরিক্ত' প্রত্যেক বছর সেলিব্রেট করতে ভাই রোনাল্ডকে একগ্লাস মদ উৎসর্গ করে পান করতেন রিচার্ড। অপারেশনের বছর-আষ্টেক পরে তিনি মারা যান, কেননা নতুন পাওয়া কিডনিটাও রোগে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রোনাল্ড অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, ২০১০-এ উনআশি বছর বয়সে মারা যাওয়া পর্যন্ত ডা. মারে-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

জীবন ও সাধনা

যোসেফ এডওয়ার্ড মারের জন্ম ১৯১৯ সালে ১ এপ্রিল, আমেরিকায় মিলফোর্ড-এ। মা ছিলেন স্কুলশিক্ষক আর বাবা বিচারপতি। জোসেফ মারে স্কুলে ভীষণ ভাল অ্যাথলিট ছিলেন, ভেবেছিলেন পেশাদার বেসবল খেলোয়াড় হবেন। কিন্তু পড়াশোনার নানা শাখায়, বিশেষ করে বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। ডাক্তারি করবেন স্থির করার আগে তিনি দর্শন আর ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হন, তারপর হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। তবে সময় পেলেই তিনি ছুটতেন নানা মিউজিয়ামে আর নাচগানের আসরে। বস্টন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা-র এরকম এক আসরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল ভার্জিনিয়া 'ববি' লিঙ্ক-এর সাথে, এবং তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল একদিন।

১৯৪৪ সালে ডাক্তার হিসেবে মারে যোগ দিলেন আর্মিতে, তার আগে পিটার বেন্ট ব্রিহাম হাসপাতালে সার্জারিতে শিক্ষানবিশি করেছেন তিনি। আর্মিতে এসে কাজ করতে শুরু করলেন প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টে, কিন্তু সব ব্যাপারে তাঁর অদম্য কৌতুহল কমল না। অজস্র রোগী, তাঁদের হাত আর মুখ কেটে, পুড়ে বীভৎস হয়ে গেছে, তাঁদের নিয়ে কাজ করতে থাকেন ডা. মারে, দেখেন এক রোগীর ত্বক বা মৃতদেহের ত্বক আরেকজনের গায়ে বসানোর চেষ্টা বারবার বিফলে যাচ্ছে, গ্রহীতার শরীর সেই নতুন ত্বক গ্রহণ করছে না। এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয় কয়েক দশক আগেই রক্ত প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে, এবং ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করে তার সমাধান করা গেছে; দাতা ও গ্রহীতার রক্ত একই গ্রুপের হলে রক্ত প্রতিস্থাপনে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু একই ব্লাড গ্রুপের দু'জনের মধ্যেও ত্বক প্রতিস্থাপন কার্যকর হচ্ছে না। অথচ তারই মধ্যে অনেক রোগীর দেহে অন্যের (মৃতদেহের) ত্বক তুলনায় অনেক বেশিদিন টিঁকে যাচ্ছে। ডা. মারে ও তাঁর সহকর্মীরা খেয়াল করেন, যাঁদের দেহে প্রতিস্থাপিত ত্বক বেশি দিন টিঁকে যাচ্ছে তাঁরা সবাই বেশিরকমের পোড়া রোগী।

একটা তত্ত্ব খাড়া করা হল—অতিরিক্ত পোড়া রোগীদের দেহে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি, যা আমাদের দেহে জীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করে, সেটা কম বলেই সেই দেহ অন্য ত্বককে মেনে নিচ্ছে। যুক্তির ধারাটা হল এই রকম : অতিরিক্ত পোড়া রোগীদের দেহে সহজে জীবাণু সংক্রমণ হয়, সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সেই শরীরে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি কম। মানবদেহে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি কাজ করে জীবাণুদের দেহের প্রোটিনগুলো চিনে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে। জীবাণুদের দেহের প্রোটিনগুলো আমাদের দেহ, বা আমাদের ইমিউন সিস্টেম, আলাদা করে চিনতে পারে, কেননা আমাদের দেহের প্রোটিনগুলোর চাইতে তারা প্রকৃতিতে আলাদা। আমাদের দেহে যে সব প্রোটিন আছে তাদের কিন্তু আমাদের 'ইমিউন সিস্টেম' আক্রমণ করে না, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলতাম। তেমনই একজনের ত্বকে যে প্রোটিন আছে সেটা অন্যের ইমিউন সিস্টেমের কাছে বাইরের প্রোটিন, ঠিক জীবাণুর দেহের প্রোটিনেরই মতো। সুতরাং সুস্থ মানুষের দেহে অন্যের (বা মৃতদেহের) ত্বক বসাতে চাইলে সেই দেহ সেটা মেনে নেবে না, 'অন্য-ত্বক'কে ঠিক জীবাণুর মতো ধরে নিয়ে তাকে আক্রমণ করবে, বা সেই 'অন্য-ত্বক'কে রিজেক্ট করবে। অতিরিক্ত পোড়া রোগীদের শরীরে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি কম, ফলে সেই শরীর 'অন্য-ত্বক'কে আক্রমণ করে 'রিজেক্ট' করতে পারছে না, ফলে সেই 'অন্য-ত্বক' টিঁকে যাচ্ছে।

সে সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি তত্ত্ব গড়ে উঠতে সবে শুরু করেছে, ফলে এই সব কথা অনুমানমাত্র, বা বড়জোর যুক্তিনির্ভর অনুমান। ফলে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দেহযন্ত্র-প্রতিস্থাপন (অরগ্যান ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট) করা যথেষ্ট সাহসের ব্যাপার, বা বলা ভাল, স্রোতের বাইরে গিয়ে চিন্তা ক'রে কাজ করার ক্ষমতার পরিচায়ক। এ নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা একবার দেখে নিই অরগ্যান ট্রান্সপ্ল্যান্টের নানা ধরন ও তার একাল সেকাল। ত্বক প্রতিস্থাপনের যে ধরনটা সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত সেটা হল নিজের শরীরের এক জায়গা থেকে ত্বক তুলে অন্য জায়গায় স্থাপন করা— প্লাস্টিক সার্জেনরা এটা বহু দিন ধরে হরদম করছেন। এটাকে বলে 'অটোগ্রাফট', নিজের শরীর থেকে নিজের শরীরেই দেহযন্ত্র (এখানে ত্বক) প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, সুতরাং দেহ তাকে 'রিজেক্ট' করে না। কিন্তু যদি এক মানুষের শরীরের দেহযন্ত্র অন্য মানুষের দেহে স্থাপন করার চেষ্টা হয় তবে সেটাকে গ্রহীতার দেহ 'রিজেক্ট' করতে পারে— এই ধরণের প্রতিস্থাপনকে বলে

কিন্তু যদি এক মানুষের শরীরের দেহযন্ত্র অন্য মানুষের দেহে স্থাপন করার চেষ্টা হয় তবে সেটাকে গ্রহীতার দেহ 'রিজেক্ট' করতে পারে

'অ্যালোগ্রাফট'। হুবহু সদৃশ যমজদের একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে দেহযন্ত্র প্রতিস্থাপন 'অ্যালোগ্রাফট'-এর একটা ধরন বটে, কিন্তু সেটা একটা খুব বিশেষ ধরন (আইসোগ্রাফট), কেননা সদৃশ যমজদের দেহের প্রোটিন তৈরির মূল ব্লু-প্রিন্ট, অর্থাৎ তাঁদের জিনসমূহ, একদম এক। ফলে 'অ্যালোগ্রাফট' হলেও তা প্রায় 'অটোগ্রাফট'-এর মতো গৃহীত হয়, শরীর বুঝতেই পারে না এটা বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা এক দেহযন্ত্র। তাই ডা. মারে এই সদৃশ যমজদের প্রতিস্থাপনের জন্য প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন, আর সফল হয়েছিলেন।

রিচার্ড হ্যারিদের পরে ডা. মারে ২৪ জোড়া সদৃশ যমজদের মধ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করেছেন। কিন্তু এখানেই থেমে গেলে তাঁর সম্পর্কে এত কথা লেখার দরকার হতো না ভাবা যেত, ঠিক সময়ে ঠিক সার্জারিটা তিনি করেছেন অনেকটাই কপালের জোরে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ১৯৫৯ সালে তিনি প্রথম এক জনের কিডনি, সদৃশ যমজ নয় এমন একজনের দেহে প্রতিস্থাপিত করলেন। আর ১৯৬২ সালে প্রথম করলেন মৃতদেহ থেকে কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট। এই ধারাবাহিক সাফল্য বুঝিয়ে দিল সদৃশ যমজদের নিয়ে তাঁর সাফল্য কোনও ফ্লুক নয়। পরে ডা. মারে-র পথ ধরে লিভার, হৃদযন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, ও হৃদযন্ত্র-ফুসফুস প্রতিস্থাপন করা হয়, আর হাজার হাজার রোগী জীবন ফিরে পান। তবে সাফল্য এক দিনে আসেনি, অনেক ব্যর্থ শ্রম, অনেক হতাশার মধ্যে দিয়ে তাঁকে সাফল্য ছিনিয়ে আনতে হয়েছিল। সেই সময়ে যাঁরা মৃতদেহ থেকে কিডনি নিয়ে অন্যের দেহে বসানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা সকলেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। মারে নিজে বেশ কয়েক বার এই চেষ্টা করে রোগীকে বাঁচাতে পারেননি। সে সময়ে অনাক্রম্যতা-বিদ্যা (immunology) নিয়ে যাঁরা বৈজ্ঞানিক চর্চা করেছিলেন, তাঁরা বলতেন একের দেহ থেকে অন্যের দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। নোবেল প্রাইজ নমিনেশন দেওয়ার কমিটির সামনে মারে বলেন, ''মেডিকাল কলেজে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, এ কাজ হাতে নিও না, তোমার বদনাম হয়ে যেতে পারে।'' সত্যি কথা বলতে কী, অনেক চিকিৎসক এই সব গবেষণার ওপরে বেশ খাপ্পা ছিলেন, সুস্থ একজনের অপারেশন করা, তাঁর কিডনিটা কেটে নেওয়া, এটা চিকিৎসকের নৈতিকতার মূল এক স্তম্ভ— 'প্রথম কথা, ক্ষতি করবে না', এর ওপরে আঘাত বলে মনে করতেন তাঁরা।

চিকিৎসকের নৈতিকতা ও দুরন্ত আশাবাদ

প্রতিটি পদক্ষেপের আগে মারে খুব সাবধানে নৈতিকতার প্রশ্ন বিচার করেছেন, আর নানা ভাবে নিজের অবস্থানের সপক্ষে জনমত তৈরি করেছেন। সদৃশ যমজের ওপর প্রথম অপারেশন করার আগে তিনি নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তারপর ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ, আর বাণিজ্যমহলের রথী-মহারথীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে সকলকে নিজের পক্ষে টেনেছেন। এর পরেও ভবিষ্যতের আইনি ঝামেলা আটকানোর জন্য ম্যাসাচুসেটস সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি বিশেষ ডিক্রি আনিয়েছেন। তবু অপারেশনের কথা সংবাদপত্র মাধ্যমে জানাজানি হওয়া মাত্রই বিতর্কের ঝড় উঠল। অনেক মহল থেকে গালিগালাজ করা হল, বলা হল — ''ভগবান এই রকম চান না। এটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে। চিকিৎসকেরা স্রেফ নিজেদের ইগো চরিতার্থ করতে এরকম অপারেশন করছেন। এটা হল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি।'' ডা. মারে ও তাঁর দল চুপচাপ নিজেদের কাজ করে চললেন।

ডা. মারে-র ধারণা ছিল দেহের অনাক্রম্যতা-ব্যবস্থাকে কোনওভাবে বোকা বানানো সম্ভব, আর সেই ভাবেই অন্যের অঙ্গ প্রতিস্থাপিত হলে দেহ তা মেনে নেবে। এই নীতির ওপর ভরসা রেখে ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে নতুন করে ভাবতে পেরেছিলেন তিনি। মানুষের ওপর অপারেশন করার আগে কুকুরের দেহে বার বার কিডনি

প্রতিস্থাপন করে নিজের টেকনিক শানিয়ে নিয়েছিলেন, তারপর সদৃশ যমজদের মধ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন অপারেশন এবং তারপর অন্য দাতার বা মৃতদেহের কিডনি প্রতিস্থাপন।

যদি পৃথিবীতে আশাবাদী একজনও কেউ জন্মে থাকেন, তবে তাঁর নাম জোসেফ এডওয়ার্ড মারে। মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে রিক মারে বলেছেন, বাবার টেবিলে একটা উদ্ধৃতি সব সময়ে থাকত, আর সেটা হল— 'কঠিন বাধা আসলে সুযোগ।' এটা অবশ্য তাঁর রোগীরাই তাঁকে শিখিয়েছেন।

টেবিলে একটা উদ্ধৃতি সবসময়ে থাকত, আর সেটা হল — 'কঠিন বাধা আসলে সুযোগ।'

যখন মারে সেনাবাহিনীর ডাক্তার তখন চার্লস উডস নামে এক বাইশ বছরের মিলিটারি পাইলটকে তাঁর রোগী হিসেবে পান। উডস-এর সারা মুখ ও হাত পুড়ে গিয়েছিল, বিশ-তিরিশ বার অপারেশন করেও সে সব পুরো ঠিক করা যায়নি। উডস-এর তাতেও যেন কোনও ক্ষোভ নেই, জীবন যা দেয় প্রশান্তভাবে তিনি তাই মেনে নেন। ছাড়া পেয়ে ওই বিকৃত চেহারা নিয়ে উডস আলাবামা-তে গিয়ে সফল ব্যবসায়ী হন, বিয়ে করেন। ডা. মারে-র আরেকজন 'শিক্ষক-রোগী' রেমন্ড ফ্রান্সিস ম্যাকমিলান। 'মোবিয়াস সিনড্রোম' বলে এক জন্মগত অসুখে হৃদযন্ত্র আর মুখের এতটাই বিকৃতি নিয়ে রেমণ্ড জন্মেছিলেন, যে তাঁর মা-বাবা তাঁকে শৈশবেই এক মানসিক হাসপাতালে ফেলে দিয়ে যান। ১৯৬৪ সালে যখন তিনি মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান, তখন তিনি ডা. মারের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য যান। মারে ও তাঁর সহকর্মীরা মুখের ওপর বহু অপারেশন করার পরে রেমণ্ড ২১ বছর বয়সে জীবনে প্রথমবার মুখ থেকে লালা গড়ানো আটকাতে আর খাবার ঠিকভাবে খেতে পারেন, আর প্রথম মুখে হাসির অভিব্যক্তি ফোটাতে পারেন। রেমন্ড-এর তালু আর হৃদযন্ত্রের ওপর অনেক বার অপারেশন হয়। তার পরেও তাঁকে মোটেও স্বাভাবিক দেখতে লাগত না। কিন্তু রেমন্ড এইটুকু সুযোগেই হাইস্কুল পাশ করেন আর তালিম নিয়ে হাসপাতালের ল্যাবরেটরির কাজে লাগেন। ডা. মারে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন— 'অপারেশন করে রেমন্ড-এর অন্তরাত্মা বিকশিত আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল।' এই সব রোগী ডা. মারে-কে আশাবাদী করে তুলেছিল।

সেই ডা. জোসেফ এডওয়ার্ড মারে চলে গেলেন। মারে-র সঙ্গে ১৯৯০ সালে মেডিসিনে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের পথিকৃৎ এডওয়ার্ড ডোনাল টমাস, তিনিও মাত্র একমাস আগে বিরানব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন। মারে-র বয়েস হয়েছিল তিরানব্বই-এর ওপরে, সুতরাং অকালপ্রয়াত বলা যাবে না। তবু তাঁর অভাব বারে বারে অনুভূত হবে, আর এ-মানুষটিকে চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা স্মরণে রাখবেন আরও বহুকাল, আর স্মরণে রাখবেন সারা দুনিয়ার অজস্র রোগী যাঁরা কোনও না কোনও প্রতিস্থাপিত দেহযন্ত্র নিয়ে বেঁচে আছেন।

লেখক পরিচিতি : ডা. জয়ন্ত দাস **স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র** কার্যনির্বাহী সম্পাদক।

সাধারণ অসুখবিসুখ ও ওষুধবিষুধ সম্বন্ধে জানতে পড়ুন—

ওষুধবিষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিত্যসঙ্গী হাতিয়ার

সংগ্রহ করবার ঠিকানা :
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট
৮৬সি, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন : ২২৬৫-২৩৬৩

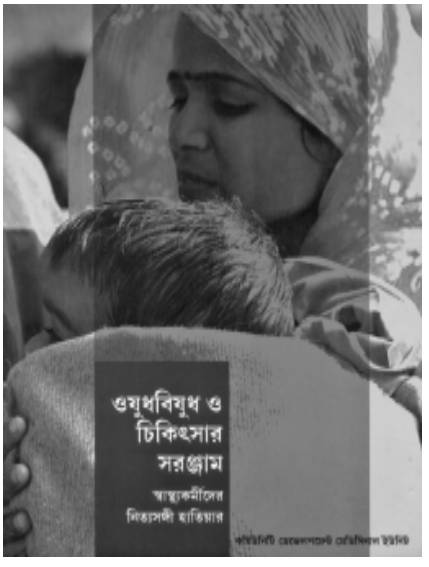

অগ্নীশ্বর: ডাক্তার যখন ভগবান

অংশুমান ভৌমিক

জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার আদি ও অকৃত্রিম ম্যাটিনি আইডল যে উত্তমকুমার এ কথা কে না জানে! আমরা একবার হিসাব-কিতাব করে দেখেছিলাম যে উত্তমকুমার যে সব ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল ডাক্তারের ভূমিকা। নয়-নয় করে ডজন খানেক ছবিতে তাঁকে অ্যাপ্রন পরে স্টেথোস্কোপ গুঁজে আউটডোরে ঘুরপাক খেতে দেখা গিয়েছে। এই তালিকায় জনপ্রিয়তম নাম অগ্নীশ্বর। ১৯৭৫ সালে ১৩ জুন রাধা, পূর্ণ, প্রাচী সিনেমায় মুক্তি পেয়েছিল এই সাদা-কালো ছবিটি।

প্রতিভা পিকচার্স প্রযোজিত ও চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত এই ছবির পরিচালক ছিলেন অধুনা নবতিপর অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। অরবিন্দের বাবা সত্যচরণ ছিলেন ডাক্তার। বছর আটেক আগে একটি সাক্ষাৎকারে অরবিন্দ বলেছিলেন, 'বিহারের কাটিহার জেলার মনিহারি গ্রামে আমার জন্ম। জায়গাটা ছিল অজ পাড়াগাঁ। বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ওখানকার প্রথম পাশ করা 'অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার'। সে সময় ব্রাহ্মণ-বদ্যিরা মড়া কাটতে চাইতেন না, তাই এই ধরনের পরিবারের ছেলেরা ডাক্তারি পড়তে গেলে, বিশেষ সুবিধা পেতেন। বাবা নিজে একটা হাসপাতাল গড়েছিলেন। 'অরবিন্দের বড়দা বলাইচাঁদও ডাক্তার ছিলেন। তবে গড়পড়তা বাঙালি আর ক'জন ডাক্তারকে এতদিন পরে মনে রাখে, আজকাল বঙ্গভূষণ-বঙ্গবিভূষণের ইয়া লম্বা ফর্দে তো একজন ডাক্তারেরও নাম ওঠে না। ভাগ্যিস একটু আধটু লেখালেখিও করতেন বলাইচাঁদ। ছদ্মনামে তাঁকে চিনেছিলাম আমরা। বনফুল। বড়দা বলাইচাঁদ ওরফে বনফুলের লেখা অগ্নীশ্বর- উপন্যাস থেকে এ ছবির পরিকল্পনা। অরবিন্দের চলচ্চিত্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সমালোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, 'তিনি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত অনুজ। বারেবরেই তিনি ফিরে যান এক অলীক শান্তিনিকেতনে। ভেঙে পড়া মানুষের মিছিল অরবিন্দবাবুতে নেই। তিনি অস্তিত্বকে প্রশ্ন করেন না। স্থির বিশ্বাসে সিনেমাকে বিনোদনের পরিসর হিসেবেই পেতে চান। অগ্নীশ্বর-এর চিত্রনাট্য নিজেই লিখেছিলেন অরবিন্দ। মধ্যবিত্ত বাঙালি যেমন ভাবে সিনেমা দেখতে চায়, বা বলা ভাল, আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে চাইত, তেমন ভাবেই একজন ডাক্তারবাবুর জীবন ও জীবিকাকে সেলুলয়েডে ধরেছিলেন অরবিন্দ। দেখেশুনে সত্যিকারের ডাক্তারবাবুরা উদ্বাহু নৃত্য করেছিলেন বলে শোনা যায় না, বরং অনেকে এ ছবিটিকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য ভাবেন বলে জানি। তবু ছবিটি আমাদের আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার যাঁরা উপভোক্তা তাঁদের কাছে অগ্নীশ্বর উচ্চকোটির ছবি। 'ওরকম সিনেমা আর হয় না।'

হালে বেরোনো 'এই সময়' বলে একটি বাংলা খবরের কাগজ ব্যতিক্রমী বাঙালিদের স্বীকৃতি দিতে 'অপরাজিত' বলে একটি শিরোপা আবিষ্কার করেছেন। এই শিরোপার প্রথম প্রাপক একজন ডাক্তারবাবু। ধীরেশ চৌধুরি। বয়স বত্রিশ। নিবাস গড়িয়া। ওই অঞ্চলের একটি ক্লাবঘরে দিনের পর দিন ধরে নিরলস ভাবে আম আদমির চিকিৎসা করে চলেছেন। যাদের মাথায় শেড নেই, হাসপাতালে বেড নেই, মেলায়-খেলায় টিকিট নেই, তাদের জন্য এই মানুষটা আছেন। এই সময়-এর প্রতিবেদক লিখেছেন, 'ধীরেশ চৌধুরী তাই কারও চোখে ভগবান, আবার কারও চোখে এ যুগের 'অগ্নিশ্বর'। ২৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে কাগজের প্রথম পাতার নিচে বেরনো এই এসক্লুসিভ রিপোর্টের হেডিং-এও ওই পূর্বসূরির অনুরণন --- 'অগ্নিশ্বর'-এর পথেই হাঁটছেন ধীরেশ।

স্বরসন্ধির একটু-আধটু জ্ঞান থাকলেই বুঝবেন যে বানানটি 'অগ্নিশ্বর' নয়, 'অগ্নীশ্বর'। তবে এহ বাহ্য। আমরা কপি-এডিটরের খুচরো ভুলে মন না দিয়ে বরং এই উচ্ছ্বসিত শিরোনামের অন্তর্নিহিত মনোভাবটিকে বুঝবার চেষ্টা করি। কীভাবে সিনেমার পরদার একজন লার্জার-দ্যান-লাইফ হিরো একজন আদর্শ ডাক্তারবাবুর সামাজিক স্বীকৃতির কষ্টিপাথর হয়ে উঠলেন তার গভীরে যাই।

অগ্নীশ্বর-এর পাবলিসিটি বুকলেট (ডাকনামে, গানের বই বা হাফটাইমের বই) খুললে দেখতে পাবেন সে আমলের কেতামাফিক ছবির গল্পটি ছবি-ছাবা নিয়ে ছাপা আছে। তার গোড়ার কথা এই রকম—'এই কাহিনীর শুরু যখন ইংরেজের শাসনে ভারতবর্ষ। এই কাহিনী শেষ হয়েছে বর্ত্তমানে। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখার্জী একজন বাস্তববাদী বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক। ডাক্তারি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বিহারের রেলওয়ে হাসপাতালের হয়ে কাজে যোগ দেন।' ইত্যাদি। চিত্রনাট্যের প্রথম দৃশ্যেই লং শটের বুকে লেখা হয়ে যাচ্ছে ১৯২৬। ছবি মুক্তি পাচ্ছে ১৯৭৫ সালে। অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতকব্যাপী কালপরিক্রমা করছে অগ্নীশ্বর।

এহেন অগ্নীশ্বর যে মেধাবী ছাত্র হবেন, তা তো বলাই বাহুল্য। বেড়ে ওঠা গ্রামে। তাতে তো আর স্কলারশিপ আটকায় না, প্রাইভেট টিউশন করে হাতখরচাও উঠে আসে। অতএব ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের ওই নিও-ক্ল্যাসিক্যাল হর্ম্যটির সিঁড়ি দিয়ে তো তাঁরই গটগটিয়ে উঠে যাবার কথা। এম বি পরীক্ষার পাশের হার মাত্র ৩০ শতাংশ হতে পারে, তা কখনও অগ্নীশ্বরের মেডিসিনে রেকর্ড মার্কস সমেত ফার্স্ট

হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। কনভোকেশনের দিন গভর্নর আসেন, গাউন পরে ছোটাছুটি করেন পাশ দেওয়া ডাক্তারকুল। আসেন না অগ্নীশ্বর। যে গভর্নর এক দিন আগে চারজন ভারতীয় ফাঁসির হুকুমনামায় দস্তখত করেছেন তার রক্তে রাঙা হাত থেকে কী করে স্ক্রোল নেবেন তিনি? স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়েও আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর এতটুকু সুযোগ হাতছাড়া করেন না অগ্নীশ্বর। সকলেই বীণা দাশ হন না, কেউ কেউ অগ্নীশ্বর হন। বাল্যবিধবা বোনের বিয়ে দেওয়া নিয়ে জেদ ধরে পিতৃগৃহও ত্যাগ করেন তিনি। বেছে নেন বিস্তৃত কর্মজীবন। তাঁর দর্শক একটু থতমত খান। তবু মানিয়ে নেন। তাঁরা বোঝেন, দুধেভাতে থাকা আতুপুতু বঙ্গসন্তানের ইমেজে বাঁধা নন এই ডাক্তারবাবু। তাঁর মধ্যে এক স্বভাববিপ্লবী আছেন। তিনি লার্জার দ্যান লাইফ। সাতের দশকে ক্রমশ রোম্যান্টিক হিরোর গতে বাঁধা ভূমিকা থেকে ক্যারেকটার রোলে সরে যাচ্ছিলেন উত্তমকুমার। এই মাহেন্দ্রক্ষণে ডা. অগ্নীশ্বর মুখার্জির সঙ্গে তাঁর জুতসই জুটি হয়েছিল।

তা কার্যক্ষেত্রে সমুৎপন্নে এই ডাক্তারবাবু করলেন কী?

এক সদাশয় ডাক্তারবাবু রেলওয়ে হাসপাতালের কেরানিকুলের মন জুগিয়ে চলতে না পারায় ট্রান্সফার অর্ডার পেয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় কাজে এসে কয়েক দিনের মধ্যেই কড়কানি দিয়ে স্টোরকিপার থেকে বড়বাবু সবাইকে টিট করে দিলেন অগ্নীশ্বর। যাঁরা এত দিন ছড়ি ঘুরিয়েছেন, তাঁরা মুহূর্তে তরুবল্লরী হয়ে গেলেন। এমনকী যে ডি টি এস সাহেব হাসপাতালের ডাক্তারদের যখন-তখন বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে খিদমত করাতেন, নরমে-গরমে তাঁকেও শায়েস্তা করলেন অগ্নীশ্বর। নিজের হাতে গাড়ি হাঁকিয়ে স্থানীয় রায়সাহেবের বাড়িতে কলে গেলেন। ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান কুলদাবাবু রায়সাহেবের মেয়ে সুছন্দার (সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়) ম্যালেরিয়া ধরতে না পেরে টাইফয়েডের ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। সে বেচারির কাছা খুলে দেবার উপক্রম করলেন অগ্নীশ্বর। এলাকার এক এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিতের উৎকোচতত্ত্বের হাঁড়ি হাটে ভাঙলেন। তারপর কী করলেন সেটা ডায়ালগ সমেত মনে করিয়ে দিই।

অগ্নি : ওষুধটা ঠিক মতো খাচ্ছো তো?

সুছন্দা : হ্যাঁ, প্রথম দিন তিনবারই খেয়েছিলাম। তারপর থেকে একবারের বেশি আর খেতে পারিনি। বড্ড তেতো!

যোগেশ : এক দাগেই যখন জ্বরটা কমেছে, তখন বাকি দু'দাগের দরকারটা কী? শুনেছি ওই কুইনিন ওষুধটা বড়ো তীব্র।

অগ্নি : আপনার গালে যদি ঠাস ঠাস করে তিনটে চড় মারার দরকার হয়, সেখানে একটা চড়ে কাজ হবে কি? সেখানে তিনটে চড়ই মারতে হবে। আমার পেশেন্টের যদি এক দাগেই কাজ হত তাহলে তিন দাগ দিয়েছিলাম কেন? রায়বাহাদুর, আমার পেশেন্ট যদি আমার কথা মতো না চলে তাহলে ভবিষ্যতে আমাকে আর ডাকবেন না। নমস্কার।

অনুমান এ দৃশ্যের শেষে পায়রা ওড়ানো হাততালি পড়েছিল প্রাচী সিনেমায়। এভাবে একের পর এক রাঘব বোয়ালকে বধ করে, ভীমরুলের চাক ফাটিয়ে ডাক্তারবাবু জয় করলেন চিকিৎসাপ্রার্থীদের শ্রদ্ধা, সহকর্মীদের সমীহ। তারপর বাবুর্চি-বেয়ারা নিয়ে কোয়ার্টারে গুছিয়ে বসলেন। বিধবা বোনের (সুমিতা সান্যাল) বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন। অবসর থাকলে 'বেপরোয়া' ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন, আঁকিবুকি কাটতেন। সে সব যথাস্থানে, যথাসময়ে বেরোত। তাঁর অগোচরেই তাঁর অনুরাগী সুছন্দা সে সব পড়ত, তাঁর কাছে 'পথের দাবী' চেয়ে নিয়ে যেত। এভাবে সে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হল। একদিন ঘর ছেড়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করল। অগ্নীশ্বরের ভুরুতে ভাঁজ পর্যন্ত পড়ল না। একদিন কী মনে হল, বদলির দরখাস্ত করে ধোঁয়া উড়িয়ে, ধুলো উড়িয়ে অন্য হাসপাতালে যোগ দিলেন।

চিত্রনাট্যে এই নতুন জায়গাটির নাম মোগলসরাই থাকলেও, পরদায় সেটি উহ্য আছে। তবে যে ভাবে আশপাশের লোকজনের বোলবোলা পালটে যাচ্ছে তাতে বিহার-উত্তরপ্রদেশের কোনও একটা রেল শহর ভেবে নিতে অসুবিধা হয় না। এই অঞ্চলটিকে অগ্নীশ্বর-এর স্রষ্টা ও পরিচালক দু'জনই কাছ থেকে দেখেছেন।

এখানেও সেই একই প্রেসক্রিপশন ডাক্তারবাবুর। একদিন চেম্বারে এক পয়সাওলা রোগী এলেন। শুকদেব ঝা। জমিদার কা বেটা। পরনে সাদা ফিনফিনে সিল্কের পাঞ্জাবি। গলায় সোনার হার। ভদ্রলোকের সিফিলিস হয়েছে। ইলাজের জন্য যা যা করণীয় তাই করতে রাজি। ডাক্তারবাবুর সব কথা শুনবেন। একটিই আবদার তার। 'ইনজাংশন কিন্তু হামার বাড়িতে গিয়ে আপনাকে দিতে হবে।' বদলে ফি হপ্তা কড়কড়ে ষোলোটা টাকা খরচা করতেও তার অসুবিধা নেই। বারফাট্টাই দেখে অগ্নীশ্বর তো মনে মনে হাসলেন খুব আর চাপা গলায় পাশ ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো দেবেনই! ভাগ্যিস আপনার মতো অকালকুষ্মান্ড কিছু বড়লোকের ছেলের জন্ম হয়েছিল, তাই ডাক্তাররা কিছু করে খাচ্ছে।... তাই ভাবছিলাম যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর দাদের চিকিৎসা করে ডাক্তারদের আর কে পয়সা রোজগার হবে বলুন। টিবি-ও আবার গরিব লোকদেরই বেশি হয়।'

এই স্বগতোক্তিতে শ্লেষ বিলক্ষণ থাকলেও সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের উপরি পাওয়া নিয়ে আম-জনতার মনের কথা এতে বেবাক স্পষ্ট। তাঁরা যে ধোওয়া তুলসী নন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তা কায়দা করে সবাইকে না জানিয়ে ছাড়বেন কেন? অবিশ্যি গরিব কা মসিহা হবার জন্য তেমন মেহনত করতে হয়নি অগ্নীশ্বরকে। তাদের মর্যাল গার্জেন হয়েও উঠেছেন অনায়াসে। পদ্ম জমাদারনি (সুলতা চৌধুরি) শাদিসুদা তো কী হয়েছে শুকদেব ঝা-র সঙ্গে গোপন আশনাই চলে। জমাদারনির শরীরে 'বিশ্রী রোগ' বাসা বাঁধে। তাকে আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে ডাগতারবাবু বলেন, 'কাজটি অত্যন্ত অন্যায় করেছো। এর ভবিষ্যৎ জানো? এরকম কাজ করতে গেলে কেন? পয়সার জন্য?' পদ্ম জানান তিনি বাজার কি অওরত নন, একটি পয়সাও নেননি। ফের ঝলসে ওঠে ডাগতারবাবুর জিভ, 'তা হলে এ পাপ করতে গেলে কেন? ভালোবাসো?' পদ্ম উত্তর দেন, 'নহি, আপ ক্যা ভিখ মাঙ্গা কো ভিখ নহি দেতে বাবুজি?' নিম্নবর্গীয় নারী তার শরীরকে ব্যবহার করে তৃপ্তি পায়, তৃপ্তি দেয়। শরীরকে শস্ত্র করে ক্ষমতাবতী হয়ে ওঠে। বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার তার মনস্তত্ত্বের নাগাল পায় না। অগ্নীশ্বরও পাননি।

তেমনই বিয়ে না করেই সুছন্দা কী করে সন্তানসম্ভবা হল এ প্রশ্নেরই কোনও উত্তর তাঁর জানা ছিল না। আমরা সে দিকে যাব না। আসলে এ ছবিতে অসংখ্য সাবপ্লট। অগুনতি কুশীলব। তাদের সঙ্গে মুলাকাতের মাধ্যমে ডাক্তারবাবুর জান-পয়চানের ভাঁড়ার উপচে ওঠে। মোগলসরাই হাসপাতালের স্টোরবাবু (নবদ্বীপ হালদার)-র ঘরনি সরমা (কাজল গুপ্ত) এমন একজন। স্টোরবাবুর রোজগারপাতি যা তাতে পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করা দায়। যেটুকু সম্ভব সেটুকু দু'টি ছেলেমেয়ের পেটে যায়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন সরমা। কবিরাজি

চিকিৎসায় ফল হয়নি। প্রথমবার ভিজিটে গিয়ে এক চিলতে বন্ধ ঘরের দরজা-জানালা খুলে দেবার নিদান দিয়েছিলেন অগ্নীশ্বর। আমরা চকিতে তাঁর মধ্যে ডাকঘর-এর রাজকবিরাজকে আবিষ্কার করেছিলাম। তাঁকে সারিয়ে তুলতে নিজের ট্যাকের কড়ি খরচা করে নিয়মিত ফল ও দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন অগ্নীশ্বর। তাতেও কাজ না হওয়ায় সরমাকে হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডে এনে ভরতি করিয়েছিলেন। তবু বাড়িতে খাবার পাচার বন্ধ হয়নি। কপালগুণে সেরে উঠেছিলেন সরমা। সর্বংসহা সর্বত্যাগী মাতৃমূর্তির এই প্রতিভূটিকে পারলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চেয়েছিলেন অগ্নীশ্বর। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিযে স্টোরবাবু অস্ফুটে বলেছিলেন, 'দেবতা'।

একটু একটু করে একমেটে দোমেটে করে দৈববিগ্রহটিতে রঙের প্রলেপ দিয়েছিলেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

তা বলে চাঁদে কলঙ্ক থাকবে না? খুব থাকবে! অগ্নীশ্বরের আচরণেও থাকবে অসংগতি। এতকাল সর্বসুলক্ষণা গৃহকর্মনিপুণা বিবাহযোগ্যা কন্যাদের 'কৃষ্ণনগরের পুতুল' ভাবতেন যে অগ্নীশ্বর, চাকরানি-কাম-রাঁধুনিকে মালা পরিয়ে ঘরে তোলায় যাঁর ঘোর আপত্তি ছিল, একদিন ঝোঁকের মাথায় দুম করে এমন এক মেয়ের পানি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আটপৌরে স্ত্রী (মাধবী মুখোপাধ্যায়)-র দিক থেকে মানিয়ে চলার চেষ্টার কোনও খামতি ছিল না। এত বড় ছবিতে গান জুড়বার উপায় বিশেষ না করতে পেরে পরিচালক মশাই কান্ডজ্ঞানের মাথায় বাড়ি মেরে একটি ঘোমটা-পরা আটপৌরে মেয়েকে দিয়ে 'তবু মনে রেখো' গাইয়ে নিয়েছিলেন। এত করেও দু'জনের বনিবনা হয়নি মোটেই। স্ত্রীর পুজোর ফুল নিজের পকেটে পুরতে রাজি হননি। জুতো পায়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মাড়িয়ে গিয়েছেন সযত্নে রচিত আলপনা। জনান্তিকে বলেছেন, 'আমি হলাম সজারু, আর বউটি হলেন তুলতুলে খরগোশ। এ হেন দু'জনে মিলে একটি ছোট্টো খাঁচার মধ্যে বসবাস করছি।' সংসার তাঁকে টানেনি। তিনি মনোনিবেশ করেছেন রোগীর চিকিৎসায়। সময় পেলে ঘরে-বাইরে-র পাতা উলটেছেন। আর কতক অনাদরে কতক অভিমানে অকালে দেহ রেখেছেন তাঁর স্ত্রী।

কমার্শিয়াল সিনেমায় কো-ইনসিডেন্সের ঘনঘটা কে না জানে! হবি তো হ, সেদিন বিকেলে এক সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করার কথা অগ্নীশ্বরের। দেরিতে হলেও পৌঁছেছিলেন সেখানে। বলেছিলেন, 'আজ এই সভায় উপস্থিত হতে আধ ঘন্টা দেরি হবার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার বাড়িতে একজন প্রিয় অতিথি এসেছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। আজ তিনি চলে গেলেন। তাঁকে বিদায় দিতে গিয়েই আমার এই দেরি।' সংলাপটি উত্তমকুমার ক্যাননের জনপ্রিয়তম সংলাপের অন্যতম।

এরপর কাট টু স্বাধীন ভারতবর্ষ। রাইটার্স বিল্ডিং- চূড়োয় তেরঙ্গা ঝান্ডা। অবসর নিয়েছেন অগ্নীশ্বর। এতক্ষণ তাঁর বাবুয়ানির ঘাটতি দেখিনি, রোজগারপাতিও কিছু কম করতেন না। এখন দেখছি পেনশনে সংসার চালানো ছাপোষা গেরস্থ তিনি। রাস্তার ধারে ঘর। আমরা দেখছি, সানডে স্টেটসম্যান-এর পাতা ওলটাতে ওলটাতে বন্ধু সৎকার করছেন তিনি। কথায় কথায় জানতে পারছি স্ত্রী-র মৃত্যুর পর থেকে প্রাইমাস স্টোভ জ্বেলে স্বপাকে সেদ্ধ ভাত খান অগ্নীশ্বর। যৌবনে যে মানুষটির মুসলমান বাবুর্চির হাতে নিষিদ্ধ মাংস না খেলে ভাত হজম হত না তিনি নাকি এখন প্রায়শ্চিত্ত করছেন। বুঝতে পারছি স্ত্রী-র গৃহকর্মনিপুণা পতিব্রতা মূর্তিটিই তাঁর মনে গেঁথে আছে। একমাত্র ছেলে ডাক্তার হয়েছে। বামুনের ছেলে হয়ে সে এক সোনার বেনের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে বলে খুব হতাশ তিনি। আর সেই সোনার বেনে নগদ পয়সায় ডাক্তার জামাই ঘরে তুলতে মুড়িমুড়কির মতো পয়সা ওড়াচ্ছেন দেখে বিয়েবাড়ি থেকে সবেগে বেরিয়ে এসেছিলেন অগ্নীশ্বর। এ সবকিছুর মধ্যে দিয়ে যে চূড়ান্ত রক্ষণশীল জাতভগীরথের ছবি এঁকেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না প্রগতিশীল মন। তবু অগ্নীশ্বর রমরমিয়ে চলে। এই সব রেসিয়াল স্টিরিওটাইপকে ঠুকে ঠুকে ঢুকিয়ে দেয় আমাদের কালেকটিভ আনকনশাসে। আধুনিক মনকে মাথায় তুলে চাট্টিখানি নাচলেও দরকার পড়লে তাকে চাঁটি মেরে নামিয়ে দিতে দেরি করে না।

ছবির শেষ পর্বটি একেবারেই আজগুবি। ছেলে-বউমার সংসারে মানাতে না পেরে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছেন পলিতকেশ অগ্নীশ্বর। তারপর অজ পাড়াগাঁয় ডিসপেনসারি খুলেছেন। সাঁওতাল পরগনার গ্রামে গরিবগুরবো দেহাতি মানুষদের মধ্যে যেটুকু পারছেন সেটুকু চিকিৎসা করছেন। তুই তোকারির মধ্যে দিয়ে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা অর্জন করেছেন। একজন সঙ্গীকেও পেয়েছেন। তিনিও অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। অগ্নীশ্বরের বর্ণনায়, 'ওর মাথাটা আমার চেয়েও বেশি খারাপ, নইলে এই বয়সে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়।' আমরা বুঝছি যে নাগরিক জীবন থেকে অগ্নীশ্বরের বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়েছে। আর এতদিন পরে তাঁকে মনে পড়েছে চিফ মিনিস্টারের। রাইটার্স থেকে তাঁর আপ্তসহায়ক ফোন করেছেন লালবাজারে আই জি খগেনবাবুকে (দিলীপ রায়)। এই খগেন স্বদেশী করেছেন একদিন, অগ্নীশ্বরের সাহায্যে হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন, এখন পুলিশের বড়কর্তা হয়েছেন। তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল অগ্নীশ্বরকে খুঁজে বার করার, মুখ্যমন্ত্রী আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী চাইছেন কলকাতার বাইরে একটি বড় হাসপাতাল করতে, অগ্নীশ্বরকে তার ভার নিতে। শেষমেশ খুঁজে পাওয়াও গেল তাঁকে।

ততদিনে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সসম্মানে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন হাসপাতালের দায়িত্ব দিতে চান শুনে তিনি বলেছিলেন, 'চিফ মিনিস্টারকে সসম্মানে গরিব মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে বোলো। আমি চৌকাঠ পার হয়ে গেছি।' এই পোড়ার দেশে সহস্র বার জন্মানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে শেষনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। নেপথ্যে বেজে উঠেছিল 'ধনধান্যপুষ্পভরা'। লেলিহান অগ্নিশিখার ওপর লেখা হয়েছিল 'ওঃ শান্তিঃ'। এই শিখাটির ওপরই টাইটেল কার্ড পড়েছিল ছবির শুরুতে। লেখা হয়েছিল 'অগ্নীশ্বর'।

মাঝেমাঝে মনে হয়, জরুরি অবস্থা ঘোষণার ১৯৭৫ সালকে কি আগুনে পেয়েছিল? নইলে অগ্নীশ্বর-এর মাস খানেকের মধ্যে রমেশ সিপ্পির শোলে বেরোবে কেন? বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র বলয়ের দু'টো ছবিই নইলে এমন আগশুদ্ধির পথ বেছে নিল কেন?

শোলে-র মতো অগ্নীশ্বর-ও অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাময় এক আধুনিক মহানায়ককে খুঁজছিল। শোলে-য় জয় বা বীরুর মতো লুম্পেন প্রোলেতারিতের মধ্যে খুঁজেছিল মহানায়ককে। অগ্নীশ্বর-এ এক ব্যতিক্রমী ডাক্তারবাবুর অতিমানবিক মুখে সেই মহানায়কের ছায়া। এ কালের বা সে কালের ডাক্তারবাবুরা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ পাবেন যে মহানায়কোচিত

শেষাংশ ৫৯ পাতায়

গল্প

বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর পাল-এর ক্লাশ চলছে। বেডসাইড ক্লিনিক। সবুজ চাদর পাতা লোহার খাটের উপর উপবিষ্ট রোগী। পাশে চেয়ারে আসীন পালসাহেব। শিক্ষার্থীরা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে স-রোগী শিক্ষককে। মোট তিনটি বৃত্ত। সামনেরটিতে প্রধানত ছাত্রীরা। উদ্বিগ্ন, গুরুগম্ভীর সারি সারি মুখ। কখন হঠাৎ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসেন রাসভারী অধ্যাপক— যাকে ছাত্রছাত্রীরা নাম দিয়েছে 'পালে বাঘ পড়া'। মাঝের বৃত্তে সুভদ্র ও শিষ্ট ছাত্রকুল। তৃতীয় বৃত্তটি মূলত দুর্বৃত্তে ভরা। যেন ঠিক মোহনবাগান গ্যালারির র‍্যামপার্ট। কেউ টুলের উপর দন্ডায়মান, কেউ পাশের রোগীর বিছানার উপর। নিতান্ত নাচার হয়েই বিভাগীয় প্রধানের ক্লাশে এসেছে। বিদ্যার্জনের চেয়ে হাজিরাই বেশি কাম্য— কারণ নির্বাচনী বা টেস্ট পরীক্ষা সমাগত। শুভবিবাহের আমন্ত্রণ পত্রে ''লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়''-র মতো।

তাই ক্লাশভোলা পথিকরা সব ঘরে ফিরেছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর Parable of the Prodigal Son-এর মতনই।

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যে মহামান্য রোগী, তাঁর নাম একটু আগেই জানা গেছে, Medical History নেবার সুবাদে। নাম শ্রী গদাধর বাগ। পিতা স্বর্গত বনবিহারী বাগ। সাকিন : আঁধারমানিক গ্রাম, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। প্রায় একমাস বহির্বিভাগে ঘোরার পর একদিন আগে শয্যা পেয়ে ভর্তি হয়েছেন। রোগী হিসাবে যোগ্যতায় নন। Examination case হিসাবে। নামে গদাধর হলেও চেহারাটি দেখে আশঙ্কা হয় পাটকাটিও ধরতে পারবেন কিনা। বাঁদিকের ফুসফুসে জল জমেছে। ডাক্তারি পরিভাষায় প্লুরাল ইফিউসান। ছাত্রমহলে রটে গেছে পরীক্ষায় ইনিই সম্ভাব্য 'লঙ কেস'। তাই বিগত ২৪ ঘন্টায় বানরসেনার মত অগণিত ছাত্রছাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর ওপর। যেন তিনি 'লঙ্-কেস' নন, স্বয়ং লঙ্কেশ রাবণ। অবশ্য গদাধরবাবু পুলকিত। এতজন হবু ডাক্তার ডাক্তারনী দ্বারা পরীক্ষিত হবার সৌভাগ্য সারা আঁধারমানিক গ্রামের সমস্ত অধিবাসী বৃন্দের সারা জীবনেও হয়নি। গদাধরবাবুর রোগের বেদনা এবং একমাস সস্ত্রীক বহির্বিভাগ চষে ফেলার যন্ত্রণা প্রায় অন্তর্হিত এই আশাতীত সৌভাগ্যে। তার ওপর আজ আবার প্রফেসর পাল-এর সস্নেহ হস্তাবলেপন। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...।

আমি আর অরুণাংশু, ডা. পালের দুই গৃহচিকিৎসক বা হাউসস্টাফ। খাড়া হয়ে আছি দুই বরকন্দাজের মতো। ইন্টার্নরা সব সুযোগ পেয়ে পালিয়েছে। ক্লাসের পর কখন রাউন্ড শেষ হবে, নতুন রোগীদের ব্যবস্থাপত্র লেখা হবে, পুরানোদের কাকে কাকে ছুটি দেওয়া হবে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান রোগীর আত্মীয়দের স্তোকবাক্যে তুষ্ট করা হবে— সেই চিন্তায় দুজনেই কাতর। অধ্যাপককে ঘিরে শনিগ্রহের তিনটি বলয়ের মতো ছাত্রবাহিনীর বাইরে আমাদের অবস্থান। আমাদের পাশেই দন্ডায়মান রেজিস্টার ডা. চন্দ, পালসাহেবেরই প্রাক্তন ছাত্র। কিছু জরুরী কাগজপত্র সই করাতে এসেছিলেন, কিন্তু সাহস করে চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারেননি। বিগত আধঘন্টায় সাতবার বলেছেন 'কি গেরো বল দেখি...'। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর বিদ্যাচর্চায় ব্যাঘাত ঘটানো তাঁর সাহসে কুলোয়নি।

গদাধরের বিছানার পাশে টিনের অপরিষ্কার টেবিলে কাঁচের গেলাসে আধ গেলাস সাদা রঙের তরল, দুটি কাঁচা পাউরুটি দিয়ে চাপা দেওয়া। ল্যাকটোমিটার দিয়ে ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব পরখ করলে ঐ তরলকে নিশ্চিতভাবে দুধ বলা কঠিন। পাশে একটি 'কাক দেশান্তরী' বা 'বাঁদরবোবা' কমলা লেবু। সকালবেলার প্রাতরাশ। দেওয়া হয়েছে সকাল আটটায়। কিন্তু বিদ্যাচর্চার ঠেলায় শ্রীযুক্ত গদাধর 'লঙকেস' বাগ তা গলাধঃকরণের সুযোগ পাননি। গতকাল বহির্বিভাগ থেকে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার ভর্তি প্রক্রিয়ার পরে, তিনটি কাউন্টার, ছটি খাতা এবং সাতটি রবারস্ট্যাম্প পেরিয়ে, পরীক্ষার কেস হিসাবে নিঃশুল্ক পরিষেবার অমূল্য সুযোগ পেয়ে এবং তৎসত্বেও অন্তত চারজন হাসপাতাল কর্মীর হাতের তালু তৈলাক্ত করে, গদাধর যখন স্বর্গের আগের স্টেশন ''মেল মেডিক্যাল ওয়ার্ডে'' পৌঁছান, ততক্ষণে মধ্যাহ্নভোজ সমাপ্ত। নৈশভোজের জন্য রোগীর তালিকাও চলে গেছে। ফলে রাত্রে হরিমটর। সকাল থেকে ছাত্রের ঢল। তার মধ্যেও গদাধর বসে আছেন হাসি হাসি মুখে। গর্বে তাঁর ছাব্বিশ ইঞ্চি ছাতি, আঠাশ ইঞ্চি হয়েছে। ভাবখানা ''সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়।''

লম্বা টানা ওয়ার্ডের দূরতম প্রান্ত দিয়ে সপার্ষদ 'রাউন্ডে আসছেন সহ-অধ্যাপক ডা. ডি.বি. ভট্টাচার্য্য। দুর্জনে বলে 'শতেং মারী ভবেৎ বৈদ্য' এই আপ্তবাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন। পার্শ্ববর্তী এলাকায় নাম ছড়িয়েছে দারুণ। ফলে হাসপাতালে বাকি সব বিছানা উপচে পড়লেও, তাঁর অধীনের শয্যাগুলির অধিকাংশই ফাঁকা। কথিত আছে তাঁর দুজন রোগী অন্যদের থেকে খবর পেয়ে, গভীর রাত্রে হাসপাতালের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতে গিয়ে জখম হয় এবং অস্থিবিদ্যা বা অর্থোপেডিক বিভাগে আবার ভর্তি হয়। ডা. ভট্টাচার্য্য কিন্তু কিছু মনে করেন নি। অর্থোপেডিকে গিয়েও রোগী যতদিন ছিল, দেখে আসতেন। ডা. পালের রোগী ও ছাত্র ভাগ্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা কখনও কখনও প্রকাশ হয়ে পড়ত। নিজেকে তুলনা করতেন গ্যালিলিও, জিওর্দানো ব্রুনো, গ্রেগর জোহান মেন্ডেল বা ভিনসেন্ট ভ্যান গখের সঙ্গে— সমকালীন সমাজ ও দুনিয়া যাঁদের চিনতে পারেনি। দুই দরজাওয়ালা লেকচার থিয়েটার এল টি সেভেনে ক্লাশ নিতে তাঁর খুবই আপত্তি ছিল। কারণ একাধিক বার পিছন ফিরে বোর্ডে লিখে, আবার সামনে ঘুরে দেখেন পিছনের দরজা দিয়ে তিন চতুর্থাংশ ক্লাশ ফাঁকা। বসে আছে শুধু ছাত্রীরা এবং তাদের অনুরক্ত গুটিকয়েক রোমান্টিক প্রকৃতির ছাত্র। আসলে ছাত্রদের কাছে ভুল খবর ছিল যে অন্য অধ্যাপক ক্লাশ নেবেন। এরপর যখন থেকে ছাত্রীরাও পালাতে লাগল, তখন ডা. ভট্টাচার্য্য বুঝলেন যে চিকিৎসাবিদ্যায় গুরুগম্ভীর তত্ত্ব কিছু নয়। হাতেকলমে চর্চাই আসল।

ডা. ভট্টাচার্য্যের বহু পুরাতন একজন রোগী হল গণেশ। আসল নাম ভুলে গেছি। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র যখন ছিলাম, তখন থেকে ওয়ার্ডের কোণের বিছানায় দেখে আসছি ক্ষীণকায় গণেশকে। প্ল্যাস্টিকের একটি রাইলস টিউব (Ryles Tube) নাক দিয়ে ঢুকিয়ে লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে কপালে সাঁটা। যেসব রোগীরা গিলতে পারেন না, তাঁদের এই ধরনের নলের সাহায্যে খাওয়ানো হয়। গণেশ

কিন্তু মুখে ভাত ডাল চিবিয়েই খেত। শুধু সকালের দুধটুকু একটা বড়ো প্লাস্টিকের সিরিঞ্জে ভরে ঐ টিউবে লাগিয়ে ধীরে ধীরে খেত সে। রাইলস টিউব তার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেন শুঁড়ের মতো— আর সেই সূত্রেই গণেশ নাম। ডা. ভট্টচার্যের অধীনের সব বিছানা খালি হয়ে গেলেও পুরাতন রোগী গণেশ কখনো যায়নি। অন্তত আমরা যতদিন ছিলাম। কিন্তু তার অসুখটা কি তা বিশেষ কারো জানা ছিল না।

ডা. পালের ক্লাস শেষ হল এগারোটার কিছু পরে। নানা তাত্বিক আলোচনার পর উপসর্গ, লক্ষণ মিলিয়ে দেখে, নানাভাবে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়। অধিকাংশ প্রশ্নে ছাত্রদের দেখে মনে হচ্ছিল উত্তরগুলি বোধকরি ঘরের ছাদে লেখা আছে। তবে ভালো ছাত্রের সংখ্যাও কম নয়। শ্রী গদাধরকে টিপে, টুকে, চিৎ করে পেড়ে ফেলে, উলটে-পালটে Pleural Effusion না Pneumonic Consolidation, তার চুলচেরা বিচার চলল বহুক্ষণ।

ক্লাশের পর চা পানের সামান্য বিরতি। তারপর দ্বিগুণ তেজে শুরু হবে 'রাউন্ড'। কিন্তু দৈনন্দিন রুটিনে এদিন ব্যাঘাত ঘটল। জরুরী মিটিং-এর জন্য অধ্যক্ষ তলব করেছেন সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের। ভগ্নদূতের কাছে জনান্তিকে শুনলাম অধ্যক্ষ কোনো এক কনফারেন্সের সূত্রে বিদেশ ভ্রমণের তদবির করতে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে। ফিরেছেন দারুণ ধাঁতানি খেয়ে। হাসপাতাল সম্পর্কে দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে কি ব্যবস্থা নিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন এ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। হাসপাতাল ও কলেজের গাফিলতিতে সরকারের ভাবমূর্তি নাকি কালিমালিপ্ত হচ্ছে। অধ্যক্ষ ফিরেই মিটিং ডেকেছেন, ঘোষণা করেছেন 'আপৎকালীন জরুরী অবস্থা'। যে যেখানে আছেন—কেউ যেন হাসপাতাল চত্বর ছেড়ে না যান। কি বিপদ! প্রখ্যাত ধাত্রীবিদ ডা. নাগের জরুরি কল এসেছে নার্সিংহোম থেকে। শল্য বিশারদ ডা. নান এই সময়টা রোজই গুটিকয়েক ছোট বড় শুশ্রূষালয়ে রাউন্ডটা দিয়ে আসেন। মুখ দেখালেই রোগী পিছু একটি করে করকরে লাল রঙের মহাত্মাগান্ধীর সহাস্য মুখ। আজকে উটকো বিপত্তিতে সব বরবাদ হয়ে গেল। বিমর্ষ মুখে ডা. নাগ ও ডা. নান চললেন অধ্যক্ষের কামরার দিকে।

ডিম্বাকৃতি মেহগনী কাঠের মহার্ঘ্য টেবিলের ওপাশে অধ্যক্ষ ডা. চৌধুরির মুখে অমাবস্যার গাঢ় আঁধার। ঠিক যেন স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে ভয়ানক পরাজয়ের পর বিধ্বস্ত হিটলার। ডাকসাইটে বিভাগীয় প্রধানেরা কিছু জিজ্ঞেস করতেই সাহস পাচ্ছেন না। অথচ অধ্যক্ষের এমন মূর্তি ভাবাই যায় না। ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর ভাগ্নী জামাই হবার সূত্রে দোর্দন্ড প্রতাপ ডা. চৌধুরি প্রায়শই সবার হাতে মাথা কাটেন। কথায় কথায় দফারফা করার ভয় দেখান। 'মাছের চোখ সন্ধানী' অর্জুনের তিরের মতই একাগ্র দৃষ্টি তাঁর সদাই নিবদ্ধ হয়ে আছে চিকিৎসা শিক্ষা অধিকর্তার পদটির দিকে। এবং সকলেই স্বীকার করে যে যোগ্যতা না হোক যোগাযোগ তাঁর অবশ্যই আছে। এহেন ডা. চৌধুরি আজ বজ্রাহত বটবৃক্ষের মতো কেন? প্রায় দশ মিনিট ঝিম মেরে বসে থেকে তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দুহাত ছড়িয়ে দিলেন সামনে যেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শাহজাহান নাটকে স্বয়ং ভাদুড়ি মশাই। বসে যাওয়া কাঁপা কাঁপা গলায় নাটকীয়ভাবে বলে উঠলেন ''Friends, everything is finished''।

অতবড় ঘড়টাতে আলপিন পতন নৈঃশব্দ। শুধু বাতানুকূল যন্ত্রের হাল্কা আওয়াজ। প্রায় পাঁচমিনিট পরে কলেজ সচিব জিজ্ঞেস করতে পারলেন ''ক্-কী? কী হয়েছে স্যার?'' ততক্ষণে উপবিষ্ট বিমূঢ় অধ্যক্ষ ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে বললেন ''... কর্তব্যে অবহেলা ... মানবাধিকার কমিশন ...এক গ্লাস জল।'' ঐ 'এক গ্লাস জল' শব্দবন্ধটি অবশ্য মূল সমস্যার অন্তর্ভুক্ত নয়, তাঁর আপ্তসহায়কের প্রতি কাতর প্রার্থনা।

''দিকে দিকে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে ...''। অধ্যক্ষ সেদিনের সভায় যাকে বলেছিলেন 'চূড়ান্তভাবে গোপনীয়', তা বাহাত্তর ঘন্টা কাটতে না কাটতেই দেখা গেল, আমাদের মেসের খাবার দেয় যে ছেলেটি, সেই শুকদেবও জানে। সকাল সাতটায় দৌড়াতে দৌড়াতে প্রাতরাশ নিয়ে ঘরে ঢুকেই শুকদেব চেঁচিয়ে উঠল, ''দাদা খবর শুনেছেন...?''। দুঃখিতভাবে বলতেই হল শুনেছি এবং ডাক হরকরা হিসাবে শুকদেবের স্থান সপ্তম। বিচলিত না হয়ে শুকদেব ছুটল তাপসদের ঘরের উদ্দেশ্যে, কারণ খবর দেবার ক্ষেত্রে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভজা আর বাঁটুল মেন হোস্টেল শেষ করে কিচেন ব্লকের দিকে আসছে। মূল কাহিনীটি কুমড়োলতার মত বাড়তে বাড়তে মগডালে চলেছে। আর তার থেকে বার হয়েছে অসংখ্য শাখা প্রশাখা—সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নানা উপকথার ঝোপঝাড়।

১৯৯২ সালের আটই জুলাই সন্ধ্যা পৌনে আটটা নাগাদ হাকিম শেখ নামে এক ক্ষেতমজুর, সারা দিনের কাজের শেষে বাড়ি ফেরার সময়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মথুরাপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। মাথায় আঘাত লাগে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। আত্মীয়-বন্ধুরা জনাব হাকিম শেখকে যে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান ভর্তির জন্য এবং যে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তা, নিম্নরূপ (সংক্ষেপিত)

কোথায় নিয়ে গেলেন? কি হল?

১। মথুরাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। (রাত ৯-০০) চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

২। ডা. হা. মহকুমা হাসপাতাল। (রাত ১০-০০) চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যান।

৩। নীলরতন সরকার হাসপাতাল (রাত ১১-৪৫) দুটি এক্সরে হল। জরুরী ভিত্তিতে ভর্তি দরকার।কিন্তু শয্যা নেই। কলিকাতা মেডিক্যালে দেখুন।

৪। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। (রাত ১২-২০/ শয্যা নেই অন্যত্র দেখুন।
৯ জুলাই)

৫। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল (রাত ১-০০টা) স্নায়ুতন্ত্রে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা নেই। অন্যত্র দেখুন।

৬। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (রাত ২-০০ টা) শয্যা নেই। অন্যত্র দেখুন।

৭। বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি সিটি স্ক্যানে রক্তক্ষরণ পাওয়া গেল। (পরের দিন সকাল ৯-০০টা) কিন্তু এমার্জেন্সী রোগী ভর্তি হয় না।

৮। এস এস কে এম হাসপাতাল শয্যা নেই। (সকাল ১০টা) অন্যত্র দেখুন।

কাহিনি আর দীর্ঘায়িত করব না। অবশেষে বন্ধুদের সাহায্যে হাকিম শেখ একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ১৪ দিন ভর্তি থেকে তাঁর প্রাণ বাঁচল। খরচ হল ১৭০০০ টাকা। তিনি যে সংগঠনের সদস্য ছিলেন সেই ক্ষেতমজুর সমিতি তাঁর চিকিৎসার টাকা দেয়।

এই কাহিনি বিশ্বাস না হলে বিদগ্ধ পাঠক মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট-এর ১৯৯২ সালের ৭৯৬

নং দেওয়ানী মামলার রায় পড়ে দেখতে পারেন। মামলাটি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুর সমিতি। ভারতীয় সংবিধানের জীবনের অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার এবং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাবার অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় সুপ্রীমকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় দেন হাকিম শেখ-এর পক্ষে। চিকিৎসা পাবার অধিকারের পক্ষে। রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন জনাব শেখের চিকিৎসার খরচ ফেরৎ দিতে। সমস্ত সরকারি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেন যে কোনো সঙ্কটপন্ন ও মুমূর্ষু রোগীকে ফেরানো চলবে না কোনো অবস্থাতেই।

এসব আইনি প্রেক্ষাপট আমরা জেনেছিলাম অনেক পরে। কিন্তু জনাব হাকিম শেখ নিজে বেঁচে উঠে আমাদের কলেজের দাপুটে অধ্যক্ষ সহ বিভাগীয় প্রধানদের নিদারুণ শিরঃপীড়ার কারণ হলেন কিভাবে? ডাকসাইটে সব উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ কলকাতা কাঁপানো ডাক্তারবাবুদের, সপ্তাহে দু-সপ্তাহে বা মাসে নানা জেলাশহরে ঘাই মারা অধ্যাপক ও সহঅধ্যাপকের সোনার অঙ্গ কালি করে দিলেন কিভাবে মথুরাপুরের এই দরিদ্র কৃষক? সবুর করুন, সেখানেই তো গভীরতম রহস্য, যা ক্রমে উন্মোচিত হবে।

তিন

একটা ছোট কমার্শিয়াল ব্রেক নিয়ে একটু ঘুরে আসি ওয়ার্ডে। রেজিস্টার ডা. চন্দ ছাত্রমহলে (আরও নির্দিষ্টভাবে বললে ছাত্রীমহলে) জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য ফাঁস করে দিয়েছেন যে শ্রীযুক্ত গদাধরের কপালে পরীক্ষায় 'লঙ কেস' হবার শিকে ছেঁড়েনি। মৈত্রেয়ী, পারভিন, সোমা, সীমা, দেবযানী, নন্দিনী, রূপালী, রীণা, অপর্ণা, মৌসুমী-দের ''ও স্যার বলুন না...'' কে প্রতিরোধ করতে না পেরে গোপনে জানিয়ে দিয়েছেন সতেরো নম্বরের গদাধর নয়, সাঁইত্রিশ এর নিতাই মন্ডল—যার হৃদযন্ত্রে দারুণ গোলযোগ, কপাটিকা অলিন্দ নিলয়ে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা - তিনিই পরীক্ষার সম্ভাব্য ''কেস।'' ফলে কালকের রাজা গদাধরের অবস্থা ফকিরের মত। কেউ আর ঘেঁষছে না। ''বাসাংসি জীর্ণানি যথা...''। বেচারা চারদিন শুকনো মুখে বসে আছে। দারুণ ভিড় জমেছে নিতাই-এর চারপাশে। সে এবার ডাঙ্গায় তোলা কই মাছের মতো খাবি খাচ্ছে— কি কষ্ট, কোথায় ব্যথা, কবে থেকে বুক ধড়ফড়— এইসব একই প্রশ্নের জবাব ঘন্টায় ঘন্টায় দিতে দিতে। বুকের ওপর স্টেথোর চেস্টপিস চেপে ধরে লাব-ডুব, মারমার (murmur) শোনার আর বিরাম নেই। কি আর করা যাবে? এরা তো আর মানুষ নয়, নিতান্তই Long case তায় বি পি এল কার্ডধারী বিনা পয়সার বেওয়ারিশ রোগী। এটুকু সইতেই হবে।

ডা. পাল প্রথিতযশা চিকিৎসক। দুর্দান্ত শিক্ষক। দোষের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্পবাক, দারুণ রাশভারি। তাঁর নামে সহ-অধ্যাপক থেকে ছাত্রকুল এক ঘাটে জল খায়। রোগ নির্ণয় অভ্রান্ত। চিকিৎসায় ধন্বন্তরী বলে খুবই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু বহির্বিভাগে বা বসবার ঘরে পেশেন্ট পার্টি ঢুকে পড়লেই অতি বিরক্ত। আমি ও অরুণাংশু দুই ফুলব্যাক। সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। ট্যাকল করে আটকাতে হয় 'বড় ডাক্তারবাবু'র দর্শন প্রার্থীদের। তাও দু'একজন নাছোড়বান্দা পার্টি গলে যান। তখন রক্ষণের শেষ স্তম্ভ প্রভাসদা। আমাদের বিভাগীয় কর্মচারী। অম্লানবদনে নাছোড়বান্দাদের বলে— ''ভিত্‌রে যাইবেন না কর্তা। পুলিশমন্ত্রী আইছেন খুড়ারে লইয়া। গ্রিপ্তার হয়ে যাবেন।''

বহির্বিভাগে পালসাহেব রোগী দেখছেন। এক রোগীর রক্তাল্পতা আছে কিনা জানতে, বলেছিলেন জিভ দেখাতে। অরুণাংশু সহকারি। সঞ্জয় লক্ষ্য করল, পালসাহেব ব্যবস্থাপত্র লিখছেন মাথা নীচু কবে, অথচ রোগী বিগত পাঁচ মিনিট ধরে জিভ বার করেই আছে, মাতা করালীর মতো। ডা. পাল চোখ তুললেন। গম্ভীর স্বরে রোগীকে বললেন— ''আপনি ইচ্ছা করলে জিভটি মুখের ভিতরে টেনে নিতে পারেন। আপনার অভিরুচি।'' একদিন এক অল্পবয়সী বিবাহিতা মহিলা এসেছেন পেটে ব্যথা নিয়ে। বিছানায় শুইয়ে পেট টিপে পরীক্ষা চলছে। স্বামী ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন হয়ে, বারণ করা সত্ত্বেও, বারবার ঢুকে পড়ছেন ভিতরে। চতুর্থবার বিরক্ত ডা. পাল বললেন, ''এই পেটটা আপনি বহুবার বহুভাবে দেখেছেন। এবার দয়া করে আমাকে একটু দেখতে দিন।'' ভদ্রলোক পগারপার, বেন জনসনের দ্রুততায়।

আমাদের আবাসিক চিকিৎসক (Resident Physician) ডা. বসুমল্লিকের কাছে শুনলাম কী সেই প্রলয়কারী ঘটনা। সকলেই চাপা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। 'ক' বাবু 'খ' বাবুকে কানে কানে বলেই সাবধান করে দিচ্ছেন কাউকে বোলো না ভাই। 'খ' বাবু আরও কম সময়ে তা জানাচ্ছেন 'গ' বাবুকে— সঙ্গে একই না বলার অনুরোধ। ফলে প্রায় আলোকের গতিতে খবর ছড়িয়েছে সারা কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে। হাসিম শেখ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা তীব্রভাবে ভর্ৎসিত হয়ে, আদালতের নির্দেশে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেন— জরুরী বিভাগে আগত সব রোগীকেই ভর্তি নিতে হবে। বিছানা থাকুক বা না থাকুক। অতিরিক্ত লোহার খাট পেতে, না হলে ট্রলিতে, না হলে মেঝেতে ম্যাট্রেস তথা তোষক পেতে। মোট কথা ফেরানো চলবে না। এটাই কোর্টের নির্দেশ। এই মর্মে কড়া সার্কুলার এসেছিল একমাস আগেই। অথচ অধ্যক্ষ বা সুপার তা ঠিকমত পড়ে না দেখায়, এই এক মাসেই বহু রোগী যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন ''Regret No Bed'' ছাপ মেরে। এই রকম কুড়িটি রোগীর সব ঠিকুজি কুলুজি সংগ্রহ করে ওৎ পেতে বসে থাকা একটি ''গায়ে মানে না আপনি মোড়ল'' মানবাধিকার সংগঠন ঠুকে দিয়েছে আদালত অবমাননার মামলা। স্পষ্ট রায় সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন। সমন এসেছে গতকাল। নড়ে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়ে স্বাস্থ্য অধিকর্তা। পার্ষদ-পরিবৃত হয়ে রাজা-উজির মারায় ভঙ্গ দিয়ে চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। প্রবল জনশ্রুতি হাকিম শেখের মতো এই কুড়ি জনও যদি পরে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে থাকেন, তবে তার কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। আদালত এ নির্দেশও দিতে পারেন যে মূল অপরাধী অধ্যক্ষের ও বিভাগীয় প্রধানদের বেতন থেকে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা হাশিল করা হোক। এছাড়া আছে আদালত অবমাননার দায়ে জরিমানা এবং সম্ভাব্য কারাবাস। দোষ ক্ষালন ও প্রবল পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়িতে চূড়ান্ত প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা। দিশেহারা সুপার। ততোধিক দিশেহারা অধ্যক্ষ, সচিব। হতচকিত বিশ / ত্রিশ হাজারি চিকিৎসককূল। এই চূড়ান্ত ডামাডোলে একমাত্র উপকৃত ডা. বলরাম কোনার। অধ্যক্ষের ঘরে ঘনঘন মিটিং চলছে। হাজিরা খাতা থাকে ডা. পালের ঘরে। ডা. কোনার ভদ্রেশ্বরে প্র্যাকটিস সেরে প্রায়দিনই হাঁপাতে হাঁপাতে সাড়ে দশটার পর ঢোকেন ও ধমক খান। মাঝে মাঝেই লেটমার্ক পড়ে। একদিন এগারোটায় ঢুকে ন'টা বলে সময় লিখে সই করেছিলেন। হাতেনাতে ডা. পালের কাছে ধরা পড়েন। এই হট্টমালার দেশে নিয়মিতই বুক চিতিয়ে এখন সাড়ে এগারোটায় ঢুকছেন। অধ্যক্ষই যদি লকআপে যান তাহলে আর ভয় কাকে? কে কার হাজিরার হিসাব রাখবে?

চার

পঠন-পাঠন মাথায় উঠেছে। টেস্ট পরীক্ষা বোধহয় পিছিয়ে যাবে। অধিকাংশ ক্লাশেই ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ''চোরে কামারে দেখা না হওয়ার'' গল্প। সর্বত্র কি হয় কি হয় ভাব। হাসপাতাল সুপার থানা গেড়ে বসে আছেন জরুরী বিভাগে। কলম্বাসের দূরবীন দিয়ে ডাঙ্গা দেখার মতো দূর থেকে রোগী দেখতে পেলেই ডুকরে উঠছেন ''ঢুকিয়ে দাও, ঢুকিয়ে দাও।'' জরুরী বিভাগের নবদা, ধরদার মহা বিপদ। ''স্যার কোথায় ঢোকাবো? একটা তো বিছানা নেই।'' সুপার ডা. দাসের উচ্চতা পাঁচ দুই। গলা রাসভনিন্দিত। চিৎকার করে উঠছেন। 'যেখানে পারেন দিন। ওয়ার্ডে, প্যাসেজে, সিঁড়িতে, বাগানে। চাইলে আমার কোয়ার্টার-এও দিতে পারেন। কোই বাত নেই।'' নবদা মিনমিন করে কী বলতে গেছিলেন। ডা. দাস ফুঁসে উঠলেন - ''আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই। আদালত অবমাননা করতে চান? কোথায় মানবাধিকার ঘাপটি মেরে আছে খবর রাখেন কি?'' ফলে পায়ে কাঁটা ফোটা, আঙ্গুল কাটা, ফুটবল খেলতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে যাওয়া সব রোগীকে ধরেই ভর্তির জন্য টানাটানি। ইমারজেন্সিতে আসা কোনো 'কেস' ফেরানো চলবে না। দরকার হলে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করে ভর্তি করতে হবে। বিছানা নেই, পথ্য নেই, ওষুধ নেই, অক্সিজেন নেই — কিছু যায় আসে না। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। কিছু সর্দি-কাশি, হাত পা কাটা ছেঁড়া রোগী পালিয়ে গেল ভর্তির ভয়ে। তিনদিন পরে শুনি টুকটাক কিছু হলে এলাকার মানুষ আর চট করে জরুরি বিভাগে আসছেন না। জরুরি বিভাগের লাগোয়া অন্দর বিভাগের (Casualty Observation Ward) অবস্থা ভয়াবহ। ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরার মতো বাথরুমের দরজা পর্যন্ত রোগী। অনেকেই বসে গল্প-গুজব করছেন। তাস খেলছেন জনা চারেক। সত্যিকারের গুরুতর রোগীরা চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। একবার উঁকি মারতে গিয়ে দেখি তিনজন স্কার্টপরা শিক্ষানবিশ সেবিকা তাঁতের মাকুর মতো উদ্বিগ্ন মুখে ছোটাছুটি করছে। একজন কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। স্টাফনার্স দিপালীদি আর চিত্রাদি চিৎকার করে আর হাত পা ছুঁড়ে প্রায় মুর্ছা যাবার অবস্থায়। 'বিশেষ সহকারি' দাদা ও মাসীরা ওয়ার্ডে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে— কারণ পা ফেলবার মতো জায়গাই নেই। সব মিলিয়ে নরক গুলজার।

উল্টোদিকে বহির্বিভাগ থেকে গুরুতর অসুস্থ ক্রনিক রোগী ভর্তি বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি। তিলধারণের জায়গা নেই। তাদের বলা হচ্ছে দুপুর দুটোর পর জরুরি বিভাগ দিয়ে ভর্তি হতে। প্রতিটি হাসপাতালেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। পরশুরামের 'গগনচটি' গল্পের মতো। প্রতিদিন গড়ে দশটি করে মিটিং হচ্ছে। অধ্যক্ষ জনান্তিকে কপাল চাপড়াচ্ছেন পচা শামুকে পা কাটায়। আপ্তসহায়ক চুপি চুপি খবর দিলেন, ডা. চৌধুরি নাকি বাড়িতে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও ষোড়শউপাচারে ভোজন বাদ দিয়ে পাখা ছাড়া, মাটিতে শুয়ে আর ডালরুটি খেয়ে জেলে থাকা প্র্যাকটিশ করছেন।

অন্য হাসপাতালগুলিতেও সাজো সাজো রব। তবে তা হল আর যেন এমন ঘটনা না ঘটে, সব রোগী যেন ভর্তি হতে পারে— তাই নিয়ে। কিন্তু আমাদের হাসপাতালে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া ঐ আদালত অবমাননার মামলা, যা হাইকোর্টে উঠবে দিন কয়েকের মধ্যে। রাজ্য সরকারের তরফে মামলা লড়ছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল, সঙ্গে অন্তত দশজন সরকারি উকিল। তাঁরা তলব করেছেন হাসপাতালের নথিপত্র, রোগীর টিকিট, রেজিস্টার খাতা। মেডিক্যাল রেকর্ড সেকশন বলে যে ঘুপচি নোংরা ঘরটি আছে তার মূল দায়িত্বে আছেন গণপতির বাহনেরা। মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত বান্ডিল করে বাঁধা ধুলোধূসরিত অসংখ্য ফাইল। ধোপার হিসাব থেকে রোগীর মৃত্যুর শংসাপত্রের প্রতিলিপি সব একসঙ্গে বাঁধা। একজন করণিক তার দায়িত্বে, প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই গৌরহরিবাবু। তিনমাস বাদে অবসর। চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা। মেডিক্যাল রেকর্ড আইনত উপাধ্যক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত। উপাধ্যক্ষ ডা. পালিত নির্বিরোধী মানুষ। ছিলেন জীবরসায়নের অধ্যাপক। উপাধ্যক্ষ হয়ে তার এঁড়ে গরু কেনার মতো অবস্থা হয়েছে। আজকাল প্রায়শই উদাসভাবে গুণগুণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাঁজছেন ''আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান...''।

সরকারি উকিলরা দুবেলা চাপ দিচ্ছেন কাগজপত্র দিন, তথ্য প্রমাণ দিন। রোগীরা যে ততটা সংকটাপন্ন বা অসুস্থ ছিল না, এই হাসপাতালে যে আদৌ ভর্তির মতো শয্যা ছিল না, অন্য হাসপাতালে যে যোগাযোগ করে ভর্তির চেষ্টা করা হয়েছিল সেসব আইনি নথিপত্র দিন। নাহলে লড়ব কেমন করে? দাপুটে অধ্যক্ষ ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে গান ধরলেন ''আমার যে দিন / ভেসে গেছে / চোখেরও জলে...''।

হাসপাতাল ও কলেজের দৈনন্দিন কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। টেবিলে টেবিলে ফাইলের পাহাড়। জরুরী ওষুধ নেই। কোম্পানি টাকা না পেয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ডামাডোলের সুযোগে খাবারের ঠিকাদার মাছ-ডিম উধাও করে দিয়ে, দেদার চালাচ্ছে কুমড়োর ঘ্যাঁট আর পচা বাঁধাকপি। অপারেশন বাতিল, নাইট্রাস গ্যাস নেই বলে। বিভাগীয় প্রধানরা যে যার পিঠ বাঁচাতে ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস পর্যন্ত শিকেয় তুলে মহাকরণে দৌড়াচ্ছেন, স্বীয় স্বীয় রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি করতে। কারণ, অধ্যক্ষ হুমকি দিয়ে রেখেছেন যে এসব যৌথ দায়িত্ব। তিনি একা জেলে যাবেন না। দরকার হলে ঘটোৎকচের মত কুরুকুল নিয়ে পড়বেন। ''তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো / একাকী যাবো না অসময়ে...''।

এর মধ্যে খবরের গন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম। বড় বড় বুম আর ভিডিও ক্যামেরা হাতে উঁকিঝুঁকি মারছে যত্রতত্র। হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে হাউসস্টাফ কোয়ার্টার, কিচেন থেকে ধোবিখানা, অধ্যক্ষের ঘর থেকে ছাত্র সংসদের অফিস। সর্বত্র অবাধ বিচরণ তাদের। বাইট চাই বাইট। আর রাতারাতি টিভির তারকা হবার আশায় যে যা পারছেন দেদার বাইট দিচ্ছেন। তাঁদের হাত ধরে হু হু করে বেরিয়ে আসছে হাসপাতালের কোণে কোণে জমে থাকা Biomedical Waste-এর মতো অসংখ্য ছোট বড় গাফিলতি, কেলেঙ্কারী, কর্তব্যে অবহেলা, দুর্নীতির কাহিনি। অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা চমকপ্রদ নানা গল্পে সংবাদপত্রের পাতা ফুলেফলে ভরে উঠছে। রেজিস্টার ডা. চন্দ এর নাম দিয়েছেন ''কোল্যাটেরাল ড্যামেজ''। সকালে প্রভাতী সংবাদপত্র বা সন্ধ্যায় টিভি খুললেই মহান চিকিৎসকের নামাঙ্কিত এই হাসপাতালের রকমারী গল্পের মহাভোজ। দু'তিনটি সংবাদ মাধ্যম উল্টোদিকের বিরজা মিষ্টান্ন ভান্ডার বা পান্ডেজীর চায়ের দোকানে সারাদিন ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। অধ্যক্ষের মুখের কাছে বুম ধরে প্রশ্ন ''স্যার, আইনজীবীরা বলছেন আপনাকে জেলে যেতে হতে পারে। আপনার কি প্রতিক্রিয়া?'' রাগে দাঁত কিড়মিড় করলেও সংবাদ মাধ্যমকে চটানো চলবে না। তাই ডা. চৌধুরি সমানে বলে যাচ্ছেন ''নো কমেন্টস্।'' বাড়ি থেকে গিন্নী ফোন করছেন ''কি গো দুপুরে খেতে আসবে?'' ডা. চৌধুরি ''নো কমেন্টস্'' বলে নামিয়ে দিলেন।

'বাইট'-এর ঠেলায় চারদিকে হুলুস্থুল। যেন কর্তৃপক্ষের গায়ে এক একটি মরণ কামড়। রোগী ও রোগীর আত্মীয়রাও প্রাণ খুলে জমা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন হাসপাতালের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আর জাঁদরেল ডাক্তারবাবুরা উত্তেজনায় আঙুল কামড়াচ্ছেন — কোথা থেকে কি বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে। চেম্বারের রোগীকে পিছনের দরজা দিয়ে ভর্তি করা, ওষুধ কোম্পানীর পয়সায় মোচ্ছব, পেসমেকার ও সার্জিক্যাল ইমপ্ল্যান্টে কমিশন, স্যালাইনের বোতলে ছত্রাক, মেয়াদ উত্তীর্ণ ইঞ্জেকশন দেওয়া, সেবিকাদের ওয়ার্ডের মধ্যেই রান্নাবান্না করে ভুরিভোজ, চতুর্থ শ্রেণীর কিছু কর্মচারীর ইমারজেন্সির লাগোয়া ঘরে গাঁজার আড্ডা, হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগের সামনে তাসা পার্টি সহ ছট পূজার হুল্লোড়, রান্নাঘরের পিছনে চোলাই-এর ঠেক— সব কেচ্ছা কেলেঙ্কারী। আমাদের অবস্থা ধরণী দ্বিধা হও। সপ্তাহান্তে একদিন বাড়ি যেতাম তাও ছেড়ে দিয়েছি। গেলেই পাড়ার লোক হামলে পড়ছে, ''কিরে, তোদের কলেজে নাকি...?'' এমন কি যেসব ছাত্র-ছাত্রীগুলো জোড়ায় জোড়ায় বাগানে ঘুরে বেড়াতো, তারা পর্যন্ত হাপিশ। যদি কাগজে ছবি উঠে যায় আর বাড়িতে দেখে ফেলে? কোথা থেকে ক্যামেরা আর বুম বেরিয়ে আসবে বলা যায় না। উপাধ্যক্ষের ছেলে গীটার নিয়ে একদিন নিজেদের কোয়ার্টার-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। পরের দিন কাগজে ছবি বেরিয়ে গেল ''হাসপাতাল ডুবছে, উপাধ্যক্ষের পরিবার গীটার বাজাচ্ছেন।'' তুলনাটা বুঝলেন তো? রোম পুড়ছে আর সম্রাট নীরো বেহালা বাজাচ্ছেন।

ঘনিয়ে আসছে Dooms Day। কালই মামলা উঠবে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসে। ''মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে...।''

পাঁচ

এক বেলায় পুরো চিত্রটা পাল্টে গেল। সকাল দশটা পনেরোতে মামলা উঠল। বিচারপতিরা কর্তৃপক্ষকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন বটে। তবে সতর্ক করে ছেড়ে দিলেন, এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে। সরকারকে কড়া নির্দেশ দিলেন রোগীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য, অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি সুনিশ্চিত করার জন্য। নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করার কথাও বলা হল। এই পর্যন্তই। সবাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। প্রধান ফটকের বাইরের ওবি ভ্যানগুলো উধাও। ডাক্তারবাবুরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়েছেন এতদিনের ক্ষতিপূরণ করতে। সন্ধ্যা হতেই জমে উঠছে গাঁজা আর চুল্লুর আসর। আবার দারুণ আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এবং হাসপাতাল আছে হাসপাতালেই।

অগ্নীশ্বর: ডাক্তার যখন ভগবান

৫৪ পাতার শেষাংশ

গুণাবলি ডাক্তারবাবুদের মধ্যেই সুলভ ছিল, অন্য কোনও পেশার মানুষের মধ্যে ততটা নয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত চাইত তাদের সামাজিক স্তর থেকে উঠে আসুন একজন আদর্শ মানুষ। তিনি হয়তো দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন না, কিন্তু স্রোতের উলটো মুখে সাঁতরে, প্রভূত চড়াই-উতরাই সামলে, আপন মুদ্রাদোষ ঢেকে ট্র্যাজিকে হিরোর মুকুট পরে হাসতে-হাসতে মৃত্যুকে বরণ করতে পারবেন। অলীক সেই শান্তিনিকেতনে স্বস্তিবাচন শুনে আশ্বস্ত হবেন উপভোক্তা দর্শক। এর সঙ্গে সনাতন বামনাইয়ের কয়েকটি খাস অভিজ্ঞান জুতে দিতে পারলে তো আর কথাই নেই। সোশ্যাল জাস্টিসের মুখে আগুন দিয়ে স্টেটাস কো বজায় থাকবে। আধুনিক মনন এ ধরনের মোটা দাগের বাজারি চালে কতখানি মাত হয় কে জানে!

পুনশ্চ। ডা. অগ্নীশ্বর মুখার্জি, এম বি। এই নেমপ্লেটটার মধ্যে ওই ইচ্ছাপূরণের অযুত সম্ভাবনা বাসা বেঁধেছিল। অন্য এক মুখার্জি ভ্রাতৃদ্বয়ের যুগলবন্দিতে তা কুবেরের আশীর্বাদ পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সরস্বতীর বরাভয় পায়নি। তবু স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষা করে যদি জানতে চাওয়া হয়, কোন সিনেমা-সেলুলয়েডের কোন ডাক্তারবাবু জনগণমনে অধিনায়কের মর্যাদা পান, সবচেয়ে বেশি ভোট অগ্নীশ্বর-এর ড. মুখার্জিই পাবেন।

এ কথা হলফ করে বলে দিতে পারি।

লেখক পরিচিতি : অংশুমান ভৌমিক শিক্ষক, প্রান্ধিক ও চিত্রসমালোচক।

With Best Complimetns from

indoco remedies limited

INDOCO HOUSE, 166 C.S.T. ROAD, SANTACRUZ (EAST),
MUMBAI-400 098 (INDIA)
WEBSITE : WWW.INDOCO.COM
PHONES : 2654 1851 / 52 / 53 / 54 / 55
FAX : (91-22) 2652 3067 / 2652 3976